চিলেকোঠার সেপাই
রাজনৈতিক উপন্যাসচিন্তার বিকল্প নন্দন

সৈয়দ আজিজুল হক*

চিলেকোঠার সেপাই উপন্যাসটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্বে সংঘটিত উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান অবলম্বনে রচিত। উপন্যাসের বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক। কিন্তু রাজনৈতিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত হলেও একটি উপন্যাস রাজনৈতিক উপন্যাসের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয় না। অন্যদিকে বিষয় হিসেবে রাজনৈতিক ঘটনার সংশ্লিষ্টতা ছাড়াও একটি উপন্যাস হয়ে উঠতে পারে রাজনৈতিক উপন্যাসরূপে সার্থকতামণ্ডিত। বিবেচনার এই পরিমাপটি যথাযথভাবে চিহ্নিত ও ব্যাখ্যা করেছেন পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *উপন্যাস রাজনৈতিক* (১৯৯১) গ্রন্থে। তাঁর মতে, রাজনৈতিক উপন্যাসের 'রূপ-গঠন নির্ভর করে বিশেষ দেশ-সময়, সমাজদৃশ্য-মানবদৃশ্যের ওপর। ইতিহাসের পরম্পরা ও উত্তরণ-অধঃপতন সম্পর্কে একটি শ্রেণীর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া একজন ঔপন্যাসিকের চৈতন্যগত চিন্তায় সংহতি পায়, সেটি যখন ভাষার চিত্রকল্পে রূপ নেয়, তখন রাজনৈতিক উপন্যাসের সৃষ্টি।' (পার্থপ্রতিম, ১৯৯১ : ১২)। একথা সত্য, রাজনীতির মূল সর্বদা প্রোথিত থাকে সমাজ-অর্থনীতি-সংস্কৃতির গভীর প্রদেশে। আমাদের এই এককালের উপনিবেশ-পরিমণ্ডলে শুধু আর্থ-সামাজিক নয়, সমগ্র মনোজগতের ওপর ঔপনিবেশিক শক্তির কর্তৃত্ব সম্বন্ধে ঔপন্যাসিকের চেতনা সর্বতোভাবে জাগ্রত না-থাকলে প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক উপন্যাস সৃষ্টিই দুরূহ হয়ে ওঠে। ওই আগ্রাসী আধিপত্যের সর্বনিয়ন্ত্রণকারী শক্তির বিরুদ্ধে জনমানসের বিপুল বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ যখন আমূল পরিবর্তনে সচেতনভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ও সক্রিয় হয় তখনই একটি সার্থক রাজনৈতিক উপন্যাস সৃষ্টি তার শর্ত পূরণ করে। *চিলেকোঠার সেপাই* এই মানদণ্ডে রাজনৈতিক উপন্যাস হিসেবে সার্থক।

বিউপনিবেশায়ন

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করলেও আমাদের বাংলাদেশ ভূখণ্ড উপনিবেশবাদের এক নতুন শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়। সেই শৃঙ্খল থেকে

---

*অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্ত হতে আমাদের বিপুল সংগ্রাম, ত্যাগ ও রক্তক্ষয়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। ১৯৭১এর মুক্তিযুদ্ধে ঘটে এর চূড়ান্ত পরিণতি। কিন্তু এর দু-বছর আগে ১৯৬৯এ অনুষ্ঠিত হয় মুক্তিযুদ্ধেরই এক পূর্ণাঙ্গ রিহার্সাল। পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে আমাদের দীর্ঘদিনের স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার আন্দোলন উনসত্তরের জানুয়ারিতে এমন এক গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয় যার পরিপ্রেক্ষিতে যুগব্যাপী চেপে-বসা জগদ্দল পাথররূপী সামরিক স্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটে। নতুন এক ফৌজি শাসক তার স্থলাভিষিক্ত হলেও জনমানুষের দাবির কাছে তাকে নতি স্বীকার করতে হয়। উপনিবেশবাদী শাসন-শোষণ থেকে মুক্তিকামী একটি সমগ্র জাতির ঐক্যবদ্ধ অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করেই ইলিয়াসের এই উপন্যাস-পরিকল্পনা। পরদেশি শাসনের নেতিবাচকতা ও দেশজ মানুষের মুক্তির ইতিবাচক স্পৃহা এ দুই সম্পর্কেই ইলিয়াসের চেতনা ছিল সুতীক্ষ্ণরূপে সজাগ। লেখক হিসেবে তিনি নিজে নিরাসক্তি-চেতনা দ্বারা চালিত হলেও ব্যক্তিমানুষ হিসেবে এই সংগ্রাম-আন্দোলনের প্রতি ছিলেন সম্পূর্ণরূপে একাত্ম। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিচিত্রমুখী বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পীড়নধর্মী অভিঘাতের সুদূরপ্রসারী পরিণাম সম্বন্ধে তিনি ছিলেন নিশ্চিতভাবেই সতর্ক। অন্যদিকে মাত্রাগত ভিন্নতা থাকলেও পাকিস্তানি শাসকশক্তির আধা-ঔপনিবেশিক শোষণধারাও যে ছিল একই খাতে প্রবাহিত সে-সম্পর্কেও ইলিয়াস ছিলেন দ্বিধামুক্ত। সুতরাং পররাজ্যগ্রাসী শোষণজাল থেকে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা তাঁর ঔপন্যাসিক সত্তাকেও করেছিল সমানভাবে উজ্জীবিত।

মুক্তির আকাঙ্ক্ষার প্রশ্নে নয়, ইলিয়াসের সমালোচনা ছিল মুক্তির স্বরূপ নিয়ে। দেশের মুক্তি তো ঘটবে; কিন্তু দেশের মধ্যেও তো রয়েছে শোষক-শোষিত; তার মধ্যে কারা লাভবান হবে উপনিবেশবাদী শোষণের অবসান ঘটলে। এই প্রশ্নটি সেদিন উত্থাপিত হয়েছিল। এটি ইলিয়াসের স্বকপোলকল্পিত নয়; এটি সেদিনের আন্দোলনের মধ্য থেকেই উত্থিত এক রূঢ়-কঠিন বাস্তবতা। ইলিয়াস শুধু এই বাস্তবতাকে যথার্থভাবে চিহ্নিত ও চিত্রিত করেছেন। যে জাতীয়তাবাদী শক্তি ছিল এই আন্দোলনের নেতৃত্বে, তাদের কাছে দেশের মুক্তিই ছিল সর্বোচ্চ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা; তারা ভাবিত ছিল না দেশের শ্রমিক-কৃষকসহ সকল নিম্নবর্গীয় মানুষের মুক্তি নিয়ে। উপন্যাসের আখ্যানে বিভিন্ন হোটেলে-রেস্টুরেন্টে বিভিন্ন চিন্তার ছাত্রনেতৃবৃন্দের মধ্যে যে আলোচনা-সমালোচনা-তর্ক-বিতর্ক হয় তাতে যেমন, তেমনি সভা-সমাবেশে উচ্চারিত স্লোগানে জাতীয়তাবাদী চিন্তার পাশাপাশি বামপন্থি চেতনার প্রকাশ আমরা লক্ষ করি। ওইসব বিতর্কে স্লোগানে দেশের মুক্তির পাশাপাশি নিম্নবর্গের মুক্তির আকাঙ্ক্ষাও ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়। একদলের চিন্তা ছিল মূলত ক্ষমতাকেন্দ্রিক; আরেকদলের ভাবনা জনগণকেন্দ্রিক, বৃহত্তর মানবকল্যাণকেন্দ্রিক। ইলিয়াসের মানবকল্যাণকামী আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে নিম্নবর্গের জীবন্মুক্তির আকাঙ্ক্ষার মেলবন্ধন ঘটেছিল। কিন্তু তখন নেতৃত্বের আসনে জাতীয়তাবাদী শক্তি; তাদের সামনে সমগ্র দেশ, দেশের শাসনপ্রক্রিয়া;

ক্ষমতার পরিবর্তনের প্রশ্নই তাদের কাছে সেক্ষেত্রে মুখ্য। শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির প্রশ্ন উত্থাপনকে তাদের কাছে বিভেদাত্মক হঠকারী বলে মনে হয়েছে। উপনিবেশবাদী শাসনমুক্তি যে নিম্নবর্গের শোষণমুক্তি নিশ্চিত করে না, এটি যে ভিন্নতর গুরুত্ববহ প্রশ্ন সেটি সম্পর্কে জাতীয়তাবাদী শক্তি হয় অসচেতন ছিল, অথবা সচেতনভাবেই তারা বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছিল। আন্দোলনের মধ্যেকার এই দ্বন্দ্বের দিকটিকে স্পষ্ট করে তোলার মধ্যেই ইলিয়াসের ঔপন্যাসিক কৃতিত্ব নিহিত।

জাতীয়তাবাদী শক্তির রাজনীতিচিন্তার এই অপরিপক্বতা বা অপূর্ণতার পরিণাম কী হতে পারে তা এই উপন্যাসের আখ্যান-পরিসরেই ইলিয়াস দেখিয়েছেন। সেজন্য আমাদের মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তীকাল বা স্বাধীন বাংলাদেশ পর্যায় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়নি। শুধু ক্ষমতার চিন্তা বা ক্ষমতাবদলের চিন্তা কোন আদর্শহীন দেউলিয়াত্বের দিকে নিয়ে যায় তার দৃষ্টান্ত উপন্যাসমধ্যেই সৃষ্টি হয়েছে। পুরনো ঢাকার সর্দারকেন্দ্রিক পরিবেশে রহমতুল্লাহ থেকে আলাউদ্দিনের কাছে কিংবা বগুড়ার মফস্বলে আনোয়ারের মামার সৌজন্যে খয়বার গাজী থেকে আফসার গাজীতে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনে আন্দোলনের নৈরাশ্যজনক পরিণামের অন্তঃসারশূন্যতা উপলব্ধি করা যায়। আমরা এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করব। এখানে যে দুটি প্রশ্ন উত্থাপিত হলো – তার একটি নিম্নবর্গের স্বার্থকেন্দ্রিক তাদের মুক্তির প্রশ্ন, আরেকটি জাতীয় মুক্তিকল্পে জাতীয়তাবাদীদের ক্ষমতালাভের প্রশ্ন – সে-সম্পর্কে আমাদের আলোচনা অগ্রসর হতে পারে। তার আগে উপনিবেশবাদীদের সাংস্কৃতিক আধিপত্য সম্বন্ধেও কিছু কথা বলা প্রয়োজন।

কালচারাল হেজিমনি

আমরা জানি যে, ইওরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তি (কলোনাইজার) তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শাসন-শোষণের বিষয়টিকে আড়াল করার জন্য তাদের বাণিজ্যিক উপনিবেশে এক ধরনের সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশ করে। সুচতুরভাবে তারা প্রচার করে যে, জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিক্ষা-সংস্কৃতি-ঐতিহ্যে ইওরোপ অগ্রসর-আলোকিত আর উপনিবেশগুলি এর সবদিক থেকেই অনগ্রসর অনালোকিত। আমাদের আলোকিত করার জন্যই তাদের আগমন ঘটেছে, শাসন শোষণের জন্য নয়। (এজন্য দ্র. Ashcroft et al., 2003; Ashcroft et al, 2004; Boehmer, 2005; Childs et al., 1997)। এই পরিকল্পিত দুরভিসন্ধিমূলক প্রচারণায় তারা বিপুলভাবে সফল হয়েছে এবং আমাদের রক্ত-স্নায়ুর মধ্যে যুগযুগ ধরে এই হীনম্মন্যতার প্রবেশ ঘটিয়ে দিয়ে গেছে যা থেকে আজো আমরা মুক্ত হতে পারিনি। পাশ্চাত্যের এই প্রচারণার পথ ধরে পাকিস্তানিরাও রাজনৈতিক শাসন ও অর্থনৈতিক শোষণের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক আধিপত্য (কালচারাল হেজিমনি[১]) সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছে। তাদের হাতে প্রধান অস্ত্র ছিল ধর্মতান্ত্রিক রাজনীতি; সে-ধর্ম হলো ইসলাম; প্রকৃতঅর্থে ইসলামের বিকৃত উপস্থাপনা। সেই অস্ত্রকে তারা ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত

নিরবচ্ছিন্নভাবে ব্যবহার করেছে; আর মুক্তিযুদ্ধকালে এর ব্যবহার ছিল সবচেয়ে নির্মম-নিষ্ঠুর ও তুলনাহীন অমানবিকতার নগ্নতায় ভরা।

যে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে তারা নতুন রাষ্ট্র গড়ে তুলল, সেই তত্ত্ব ভুল হলেও, তা দ্বারা তারা বিপুলসংখ্যক মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। এই বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত হতে আমাদের বেশ কিছুটা সময় অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু ওই মোহাচ্ছন্ন পরিস্থিতিতেই তারা ভাষা নিয়ে, ধর্মের বিশুদ্ধ চর্চা নিয়ে আরেক ধরনের উপনিবেশবাদী উচ্চম্মন্যতার আইডিয়ার জন্ম দিয়েছে, যাতে এদেশের অনেক লোকই বিশ্বাস স্থাপন করে আরেক বিভ্রান্তির ফাঁদে পড়েছে। তাদের প্রচারণার সারকথা ছিল : 'পাকিস্তানিরা মুসলিম হিসেবে অনেক বিশুদ্ধ, তাদের সংস্কৃতি অনেক বিশুদ্ধ ইসলামি সংস্কৃতি, উর্দু মুসলমানদের ভাষা। সেই তুলনায় পূর্ববাংলার সংস্কৃতি অনেকটা হিন্দু সংস্কৃতি-প্রভাবিত হওয়ায় এখানকার মুসলিমরা বিশুদ্ধ নয়, এদের ভাষা বাংলাও হিন্দুগন্ধী।' এইসব উদ্ভট, যুক্তিহীন, বিজ্ঞানবোধহীন মিথ্যাচার শেষ পর্যন্ত অবশ্য পরিত্যক্ত হলেও বহু মানুষ অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে এই মূর্খ প্রচারণার শিকার হয়েছে। ইলিয়াস তাঁর উপন্যাসে সাংস্কৃতিক আধিপত্যমূলক এসব প্রচারণার মুখোশ উন্মোচন করেছেন। পাকিস্তানপন্থিদের ধর্মাচরণের অন্তঃসারশূন্যতাকে তার অনৈতিকতা ও স্বার্থপরায়ণতাসহ স্বচ্ছ করে তুলেছেন। উপন্যাসে তিনি দেখিয়েছেন, পুরনো ঢাকার সর্দার রহমতউল্লা আর বগুড়ার গ্রামাঞ্চলের জোতদার খয়বার গাজীর জীবনাচরণের উপরিতলে ধর্মতন্ত্রের যে আচ্ছাদন তার সবটাই শোষণের লক্ষ্যে কৃত্রিমভাবে নির্মিত। তারা যে রাষ্ট্রশক্তির প্রতিনিধিত্ব করছে তাদের জীবনগতির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যার মাধ্যমে ইলিয়াস সেই শক্তির স্বরূপ উন্মোচন করেছেন।

এর বিপরীতে তিনি বাংলাদেশের সংগ্রামশীল জনগোষ্ঠীর সততা, নিষ্ঠা আর মানবপ্রেমকে উচ্চকিত করে তুলেছেন। তিনি চিত্রায়িত করেছেন দেশপ্রেমের লক্ষ্যে আন্দোলনমুখর জনতার ত্যাগধর্ম ও বীরত্বব্যঞ্জকতা; যার মধ্যে নিহিত রয়েছে প্রকৃত মানবীয় মহত্ত্ব। উপনিবেশবাদের সাংস্কৃতিক আধিপত্যমূলক ধর্মীয় আবরণের অন্তঃসারশূন্যতার বিপরীতে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন এ ভূখণ্ডের মানুষের অন্তরের প্রশস্ততাসহ প্রকৃত মানবধর্মকে। উপন্যাসে সংগ্রামের যে স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে তাতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়, অসাম্যের বিরুদ্ধে সাম্য, ব্যক্তিস্বার্থের বিরুদ্ধে সমষ্টিস্বার্থ, অগণতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাই ছিল মূলকথা।

নিম্নবর্গের উত্থান

এখন আমরা আসি নিম্নবর্গের প্রশ্নে। উপনিবেশবাদী শোষণের সঙ্গে নিম্নবর্গের দুর্ভোগ-দুর্যোগ আর দুর্বিপাকে পতিত হওয়ার প্রশ্নটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একথা ঠিক, ইতিহাসের সর্বকালেই নিম্নবর্গ সর্বদা শোষণ, বঞ্চনা, লাঞ্ছনা আর অবহেলার শিকার। কিন্তু এই বিষয়টি কখনো উচ্চস্তরের জ্ঞানচর্চায় কোনো গুরুত্ব পায়নি। উনিশ শতকের

শেষার্ধ থেকে মার্কসীয় সাহিত্যে এবং বিশ শতকে উত্তর ঔপনিবেশিক পরিবেশে নতুনতর জ্ঞানকাণ্ডে তাদের শূদ্রতার বিষয়টি অনেক মনোযোগ দাবি করছে। কালচারাল হেজিমনির পাশাপাশি সাবঅলটার্ন (নিম্নবর্গ) কথাটারও জন্মদাতা ইতালির মার্কসবাদী দার্শনিক আন্তোনিও গ্রামশি (১৮৯১–১৯৩৭)। সত্তরের দশক থেকে প্রাচ্যভূমির উত্তর ঔপনিবেশিক পরিমণ্ডলে সাবঅলটার্ন স্টাডিজ মুখ্য স্থান জুড়ে আছে। 'ক্যান দি সাবঅলটার্ন স্পিক?' – গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের (জ. ১৯৪২) এই রচনা-শিরোনামটিই জগদ্বাসীর সামনে এক বিরাট প্রশ্ন হিসেবে বর্তমানে বিরাজমান। আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করছি, মানবসভ্যতার আদি লগ্ন থেকে নিম্নবর্গের কণ্ঠ তো আসলেই অনুচ্চারিত থেকে গেছে। কেবল রাজা-বাদশাহ-জমিদারসহ ক্ষমতাপুষ্ট বিত্তবান উচ্চবর্গের সাফল্য-ব্যর্থতার বিবরণ নিয়েই তো ইতিহাসের পাতা পরিপূর্ণ। আজকের লেখক-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের সামনে তাই নিম্নবর্গের কণ্ঠস্বরকে ভাষারূপ দেওয়ার এক গুরুদায়িত্ব এসে উপস্থিত। ঔপন্যাসিকদের ক্ষেত্রে এটি আরো বেশি প্রযোজ্য। কারণ, মানবজীবনের প্রকৃত প্রতিফলনেই তো একটি উপন্যাস সার্থক হয়ে ওঠে। ইলিয়াসের ঔপন্যাসিক সত্তা এই সত্যকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করেই তাঁর উপন্যাসে নিম্নবর্গের কণ্ঠকে যথাযথ গুরুত্ব সহকারে রূপায়িত করতে আগ্রহী হয়েছে।

চিলেকোঠার সেপাই উপন্যাসে শহর পর্যায়ে হাড্ডি খিজির এবং গ্রাম পর্যায়ে চেংটু নিম্নবর্গের প্রতিনিধিত্বশীল চরিত্র। গ্রাম-শহর উভয় পরিবেশেই এই বর্গভুক্ত আরো অনেক চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছেন লেখক; যেমন : বজলু, জুম্মন, করমালি, পচার বাপ, নাদু পরামানিক প্রমুখ। কিন্তু খিজির ও চেংটু রাজনীতি ও সমাজসচেতন প্রতিবাদী চরিত্র হিসেবে সবচেয়ে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। খিজির ও চেংটু উভয়েই সামরিক স্বৈরতন্ত্রের কেন্দ্রশক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলনে যুক্ত হয়ে যেমন ধ্বনিত করে তাদের সক্রিয় প্রতিবাদ, তেমনি একই সঙ্গে শাসকশক্তির স্থানীয় প্রতিনিধি রহমতউল্লা ও খয়বার গাজীর শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে সম্পূর্ণ নির্ভীকভাবে তৎপর হয়ে ওঠে। স্বৈরতন্ত্রবিরোধী আন্দোলন উভয়ের মনোজগতে নিয়ে আসে অকল্পনীয় পরিবর্তন, যা চিরাচরিত নিয়ম-প্রথা ভেঙে অকুতোভয় তথা অস্তিত্ববান হয়ে উঠতে তাদের সহায়তা করে। দেশব্যাপী আন্দোলন-সংগ্রামের পরিবেশই তাদের শোষণবিরোধী কার্যক্রমে এমন দৃঢ়চিত্ত ভূমিকা পালনে দুঃসাহসী করে তোলে। সমষ্টিবদ্ধ মানুষের সংগ্রামশীল চেতনার উত্তাপই তাদের করে তোলে এরূপ অনমনীয়, পরিণামভয়শূন্য।

এই নির্ভীকতার দৃষ্টান্ত আমরা উপন্যাসের সূচনাতেই দেখি। বাইরে রাজপথে মিছিল-মিটিং চলছে অবিরামভাবে; তারই মধ্যে নানা হোটেল-রেস্তোরাঁর আড্ডায় ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবীদের আলোচনায় চলছে রাজনীতি নিয়ে প্রখর সব বিচার-বিশ্লেষণ-বিতর্ক। আমজাদিয়া হোটেলে এমনই এক উচ্চকণ্ঠ তপ্ত বিতর্কের মধ্যেই সেখানে

প্রবেশ করে মিছিল-ফেরত তৃষ্ণার্ত একদল ছাত্রের সঙ্গে সঙ্গে এক দঙ্গল পথশিশু-পিচ্চিও। আর কারো নজরে পড়ে না, অথচ এই নিম্নবর্গীয় টোকাইদের দৃষ্টি এড়ায় না রেস্তোরাঁ ম্যানেজারের পেছনে দেয়ালে-ঝোলা মার্শাল আইয়ুবের ছবি; যাকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য তারা দিনরাত স্লোগান দিচ্ছে। সুতরাং তারা পিপাসা নিবারণের কথা ভুলে প্রত্যক্ষীভূত শাসককে সিংহাসনচ্যুত করতেই তৎপর হয়ে ওঠে। ছবির দিকে ছুঁড়ে মারে পকেটে-গোঁজা ইটের টুকরা; তারপর ছবিটি ভূপাতিত হলে পথশিশুদের কফ-থুথু-ধুলামাখা চির নগ্ন পদের আঘাতে জর্জরিত-লাঞ্ছিত হয় এশিয়ার কথিত লৌহমানবের মুখাবয়ব। উনসত্তরের আন্দোলন এই নিম্নবর্গীয় পথশিশুদের দুঃসাহসী করে তুলেছে; উচ্চবর্গীয় ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী সমাজ, হোটেল মালিক কাউকে আর তারা পরোয়া করে না। পথশিশুদের কারণেই আইয়ুবের (তখনও দেশের প্রেসিডেন্ট) ছবি নামাতে বাধ্য হয় ম্যানেজার। চিরকালের ক্ষমতাহীন নিম্নবর্গও কীভাবে শক্তি অর্জন করে তার বাস্তব চিত্র ইলিয়াস এভাবে অঙ্কন করেছেন। দেখিয়েছেন, তাদের কণ্ঠ আর নিষ্ক্রিয়-নিরুদ্ধ নয়। মিছিলে-মিটিংয়ে উচ্চবর্গ-মধ্যবর্গের সঙ্গে তারাও সমান অধিকারে সমান আবেগে দৃপ্ত কণ্ঠে দৃপ্ত পদভারে অংশগ্রহণ করে। বরং তুলনামূলকভাবে তাদের কণ্ঠই কখনো কখনো থেকেছে অধিক উত্তেজিত, অধিক উচ্চগ্রামে কম্পিত।

এই যে ব্যাপক পরিবর্তন-উন্মুখ একটি বৃহত্তর আন্দোলন শ্রেণিগত ও বর্গীয় পার্থক্যকে পাশ কাটিয়ে সকলকে এক কাতারে আনার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে তার সর্বোচ্চ পরিণতি আমরা খিজির ও চেংটু চরিত্রে লক্ষ করছি। বস্তিবাসী রিকশাওয়ালা খিজির যেমন তার মালিক আলাউদ্দিনের সঙ্গে কিংবা চাকরিজীবী ওসমানের সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে সমান যোগ্যতায় একই পাটাতনে আলাপ করে তেমনি গ্রামীণ পটভূমিতে হতদরিদ্র কৃষকপুত্র অশিক্ষিত চেংটুও ছাত্রনেতা আলিবক্সের সঙ্গে কিংবা কলেজশিক্ষক বামনেতা আনোয়ারের সঙ্গে একই সমতলে থেকে রাজনীতিবিষয়ক সংলাপে অংশগ্রহণ করে। এক্ষেত্রে যেন উভয়ের মধ্যেকার ব্যবধান ঘুচে গেছে; কারো দিক থেকেই একে আর অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না। ইলিয়াস উনসত্তরের আন্দোলনের শক্তির এই ব্যাপকতার দিকটি নিম্নবর্গীয় উত্থানের মধ্য দিয়েই শুধু দেখাননি। তিনি আরো দেখিয়েছেন, নিম্নবর্গ তার সাহসী প্রতিবাদস্পৃহার মধ্য দিয়ে মানবিক মহত্ত্বে মধ্যবিত্তকে অতিক্রম করে গেছে। এক ইদের রাতে খিজিরের ট্যাক্সিযাত্রী এক নববধূ গুণ্ডাদের দ্বারা অপহৃত হওয়ার পরেও তার উচ্চশিক্ষিত আমলা স্বামী এর প্রতিকার বা প্রতিবাদে সক্রিয় না হলে খিজির তার মেরুদণ্ডহীনতাকে ঘৃণার চোখে দেখে। এমন অপমানকর পরিস্থিতি থেকে অস্তিত্ববান হয়ে ওঠার একটাই পথ : প্রতিবাদে উচ্চকিত হওয়া; কিন্তু খিজিরের এ পরামর্শ মানার পরিবর্তে আমলা মধ্যবিত্তটি চাকরির ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে স্ত্রীর চরম অপমানকর লাঞ্ছনার ব্যাপারেও থাকে নির্বিকার।

মধ্যবিত্তের এই মেরুদণ্ডহীন কেঁচোসদৃশ রূপের বিপরীতে প্রতিবাদে আগ্রহী খিজিরের অবস্থান তুলে ধরে নিম্নবর্গের মধ্যেই সত্যিকার আত্মমর্যাদাবোধের প্রকাশ ঘটিয়েছেন লেখক।

খিজির ও চেংটু উভয় চরিত্রে আমরা লক্ষ করি তেজস্বিতা ও বলিষ্ঠতা। এর কোনো পারিবারিক পটভূমি খুঁজে পাওয়া যায় না। ফলে এর উৎস তাদের শ্রেণিগত পরিসরসহ সমকালীন আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্যেই অনুসন্ধানযোগ্য। এ উপন্যাসে উভয় চরিত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে; কিন্তু জীবনে কেউই পরাজিত হয়নি। তারা শত্রুশক্তির হাতে ধ্বংস বা বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু পরাভূত হয়নি, উন্নত মস্তককে অবনত হতে দেয়নি। জীবনযুদ্ধে তারা অপরাজেয়, লড়াকু সৈনিক। অন্যায়ের বিরুদ্ধে, শোষণ ও জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্পৃহায়ই তারা হয়ে উঠেছে অস্তিত্ববান ও মর্যাদাবান। স্ত্রীর সান্নিধ্যসহ বস্তি ত্যাগে বাধ্য হলেও খিজির স্ত্রীর পরামর্শে রহমতউল্লার কাছে ক্ষমা চেয়ে সমঝোতার পথ গ্রহণ করেনি। তার স্ত্রী রহমতউল্লার কাছ থেকে সন্তানের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার স্বার্থে অনৈতিক সমঝোতার যে পথ অবলম্বন করেছে সেটাই বরং অমর্যাদাকর। চেংটুর ক্ষেত্রেও লক্ষ করি, তার পিতা তাকে বিদ্রোহ-প্রতিবাদের পথ পরিহার করে জোতদার খয়বার গাজীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনাসহ সমঝোতার পথ অবলম্বনের পরামর্শ দেয়। কিন্তু পিতার পরামর্শ গ্রহণ না-করে অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে সে তার অবস্থান অক্ষুণ্ন রাখে। উনসত্তরের গণজাগরণসহ দেশজুড়ে উত্তাল আন্দোলনই নিম্নবর্গের এমন ঐশ্বর্যপূর্ণ অবস্থানের, বীরত্বব্যঞ্জকতার জনক।

এই সূত্রেই উল্লেখযোগ্য আখ্যানে লেখকের ঐশ্বর্যময় কল্পনা বিস্তারের আরেক অসামান্য দিক। সেটি হলো, উনসত্তরের আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল ছয় দফা দাবি আদায়; আর আশু লক্ষ্য ছিল আগরতলা মামলার আসামি হিসেবে বঙ্গবন্ধুসহ রাজবন্দিদের মুক্তি ও সামরিক স্বৈরতান্ত্রিক শাসক হিসেবে আইয়ুবের পতন। এক পর্যায়ে শেষ দাবিটিই হয়ে ওঠে একমাত্র ও মুখ্য। সংগ্রামী জনতার কাছে, বিশেষত নিম্নবর্গের কাছে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্যতা পায় এই দাবিটিই। এমন পরিস্থিতিতেই খিজির জানতে পারে তার স্ত্রীর গর্ভে এসেছে তারই ঔরসজাত সন্তান; কিন্তু রহমতউল্লা খিজিরের ওপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার লক্ষ্যে তার স্ত্রীকে পূর্বস্বামীর সঙ্গে বিয়ে দিতে ও গর্ভের সন্তানকে বিনষ্ট করতে উদ্যত। অতঃপর নিজ সন্তানকে বাঁচানোর জন্য খিজিরের কাছে রহমতউল্লার পতনই হয়ে ওঠে একমাত্র কাম্য। আর রহমতউল্লার পতন নিশ্চিত করতে হলে তার ক্ষমতার উৎস আইয়ুবের পতন প্রয়োজন সর্বাগ্রে। তাই খিজির আরো বেশি করে আইয়ুবের ধ্বংসকামী এই আন্দোলনে সক্রিয় হয়। এক লৌহমানবের শাসন অবসানের লক্ষ্যে পরিচালিত এই দেশব্যাপ্ত সাড়ে সাত কোটি মানুষের স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষার আন্দোলনের সঙ্গে ঢাকা শহরের বস্তিবাসী এক উন্মূলিত সত্তা নিম্নবর্গীয় খিজিরের নিজ সন্তান রক্ষার মাধ্যমে মূলীভূত হওয়ার স্বপ্নকে

একাত্ম করে তুলেছেন লেখক। এর মধ্যে ইলিয়াসের উন্নত মহৎ মানবিক চিন্তার পরিচয়ই বিধৃত। বিষয়টির প্রতীকী তাৎপর্যও বিশাল। একটি সন্তানের জন্মের মাধ্যমে এক নিম্নবর্গের মূলীভূত হওয়ার সঙ্গে একটি দেশের জন্ম ও একটি ভূখণ্ডের সমগ্র জনগোষ্ঠীর শেকড়ায়িত ও সার্বভৌমত্ব অর্জনের বিষয়টিকে লেখক প্রতীকায়িত করে তুলেছেন। আর এখানেই তাঁর ঔপন্যাসিক সত্তার সার্থকতাও নিহিত। এভাবেই ইলিয়াস নিম্নবর্গের কণ্ঠস্বরকে করে তুলেছেন সীমাহীনভাবে গুরুত্ববহ।

ক্ষমতার বিচিত্র রূপ

আর এই প্রসঙ্গেই ক্ষমতার বিষয়টি বিচার্য। যে ক্ষমতা দিয়ে রহমতউল্লা ও খয়বার গাজী পিষ্ট করতে চায় খিজির ও চেংটুর প্রতিবাদস্পৃহাকে, বিনষ্ট করতে চায় খিজিরের ভবিষ্যৎ সন্তানকে, তার মূল নিহিত রাষ্ট্রক্ষমতার সুউচ্চ গ্রন্থির মধ্যে। আইয়ুবি শাসনচক্রে মৌলিক গণতন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতার অংশীদারিত্বের এটা একটা দিক; অর্থাৎ রাষ্ট্রশক্তির ক্ষমতাকাঠামোর এক ধরনের বিন্যাস এটি। কিন্তু ক্ষমতার বিষয়টি শুধু রাষ্ট্রকাঠামো নির্ভর নয়, নয় রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামে জনগণের বিপুল একাত্মতা বা দলীয় শক্তিবিন্যাসের ওপরও; সমাজে-পরিবারেও তার রয়েছে বিচিত্র উৎসমুখ।

এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় আন্তনিও গ্রামশির ক্ষমতাবিষয়ক ধারণা ও মিশেল ফুকোর (১৯২৬-১৯৮৪) ক্ষমতাতত্ত্ব। গ্রামশি দেখিয়েছেন, সাবঅলটার্ন শ্রেণির বিপরীতে রয়েছে কর্তৃত্বপরায়ণ বুর্জোয়া শ্রেণি; যারা শাসনতন্ত্রেই তাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করে না, কায়েম করে এক সর্বাত্মক সামাজিক হেজিমনি। তবে কাউন্টার হেজিমনি সৃষ্টির মাধ্যমে সাবঅলটার্ন শ্রেণিও বিকল্প সামাজিক আধিপত্য সৃষ্টি করতে পারে। (পার্থ, ২০০৭ : ১৭০-১৭৩)। অন্যদিকে ফুকো আধুনিক ক্ষমতাতন্ত্রের এক ধারণার জন্ম দেন। যেখানে রয়েছে কারাগার, হাসপাতাল, শিক্ষালয়, উপাসনালয়, সেনাছাউনি, কারখানা থেকে শুরু করে নানা প্রতিষ্ঠান, যেখানে রয়েছে নজরদারির ব্যবস্থা, যার উদ্দেশ্য মানুষকে নজরবন্দি রেখে সংশোধন ও সামাজিক অনুশাসনে শিক্ষিত করে তোলা। তাঁর মতে, অনুশাসনই আধুনিক ক্ষমতাতন্ত্রের প্রধান অস্ত্র, যার উদ্দেশ্য মানুষের কল্যাণসাধন। (পার্থ, ২০০৭ : ১৭৪-১৭৫)। ফুকোর মতে, মধ্যযুগে ও আধুনিক যুগে শাস্তির প্রক্রিয়া ভিন্নতর; মধ্যযুগে শাস্তির লক্ষ্যবস্তু ছিল মানুষের শরীর, আধুনিক যুগে মানুষের মন, তার চরিত্র সংশোধন। আধুনিক যুগের প্রতিষ্ঠানসমূহে (পূর্বে উল্লেখিত) রয়েছে উচ্চ থেকে নিচ পর্যন্ত ক্ষমতার স্তরবিন্যাস, যার মাধ্যমে নজরদারি, দমন ও সংশোধনের প্রক্রিয়া বহমান। (আকাশ, ২০০৭ : ১৯৬-১৯৯)। ফুকো তাঁর 'মাইক্রোফিজিক্স অফ পাওয়ার' (১৯৭৭) বক্তৃতায় বলেন, ক্ষমতার প্রধান কাজ দমন করা। আর 'দি হিস্টরি অফ সেক্সুয়ালিটি' (১৯৭৮-৮৫) বইয়ে ঘোষণা করেন, ক্ষমতা সর্বত্র উপস্থিত, কারণ তা আসে সকল কিছু থেকেই। (ফয়েজ, ২০০৭ : ৯৯)। ফুকোর মতে, প্রতিটি সামাজিক সম্পর্কের পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে

ক্ষমতার স্পন্দন। শুধু রাষ্ট্রযন্ত্র, রাজনৈতিক অঙ্গন বা আর্থনীতিক কাঠামো নয়, ক্ষমতা বিস্তৃত হয়ে আছে সকল প্রকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। (আকাশ, ২০০৭ : ২০০)। তাঁর মতে, ক্ষমতা হল অপ্রতিরোধ্য ও বাধাহীন।[২]

এই দুই আধুনিক সমাজতাত্ত্বিকের ক্ষমতাসংক্রান্ত ধারণা বা তত্ত্বের আলোকে বিবেচনা করলে আমরা *চিলেকোঠার সেপাই* উপন্যাসে ক্ষমতা কেন্দ্রের বড়-ছোট নানা বিচিত্রমাত্রিক রূপের সঙ্গে পরিচিত হব। প্রথমেই স্মরণীয় যে, এ উপন্যাসের সমগ্র পরিকল্পনার মধ্যেই রয়েছে এক বিপুল ক্ষমতাচক্রের বিরুদ্ধে জনউত্থান। এক যুগ ধরে চেপে-বসা সমরাস্ত্রসজ্জিত স্বৈরতন্ত্রের এক জগদ্দল পাথর অপসারণের জন্য নিরস্ত্র মানুষের ঐক্যবদ্ধ শক্তির লড়াই। ওই রাষ্ট্রক্ষমতার পেছনে আছে সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্র, সকল সশস্ত্রবাহিনী, পুঁজিপতি শ্রেণিসহ সকল শোষকশক্তি। গ্রামশির ধারণা অনুযায়ী, রাষ্ট্রকাঠামো ও বুর্জোয়া শ্রেণি কর্তৃক ক্ষমতার আধিপত্যের মাধ্যমে নিম্নবর্গের ওপর দমন-পীড়ন পরিচালনার পাশাপাশি এ উপন্যাসে নিম্নবর্গের কাউন্টার হেজিমনি সৃষ্টির প্রয়াসও লক্ষণীয়। শহর-গ্রাম উভয় পরিসরের জন্যই এটা বাস্তবতা। সরকারের সশস্ত্র বাহিনীসমূহের পাশাপাশি রহমতউল্লা এবং খয়বার গাজী প্রমুখ সরকারি প্রতিনিধিরাও যতভাবে পারছে হত্যাকাণ্ডসহ কঠিন দমন-পীড়নমূলক ব্যবস্থার শরণাপন্ন হচ্ছে। কারফিউ জারি, সরাসরি গুলি চালনা, বস্তি থেকে উচ্ছেদ, গুণ্ডা দ্বারা আক্রমণ, গরু চুরি ও গরু খোয়াড়ে রেখে আর্থিক সংকটে ফেলা, গুপ্ত হত্যা প্রভৃতি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এর বিপরীতে উচ্চকিত হয়েছে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবর্গের প্রতিবাদ। সেই প্রতিবাদে আইয়ুবের ছবি ভূপাতিত ও পদপিষ্ট হয়েছে, রহমতউল্লার গুণ্ডারা প্রতিআক্রমণে বিধ্বস্ত হয়েছে, হোসেন আলি ফকির তার বাথানসহ অগ্নিদগ্ধ হয়েছে আর খয়বার গাজী বিচারসভার মুখোমুখি হয়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছে। ঢাকার সরকারি অফিসের সর্বনিম্নপদস্থ কর্মচারীদের প্রতিবাদমূলক অনুপস্থিতি উচ্চপদস্থদের অসুবিধা ও অস্বস্তির কারণ হয়েছে। এই কাউন্টার হেজিমনির কারণেই সংগ্রামী ছাত্র নেতৃবৃন্দ সমাজে মর্যাদাবান ও মান্যবর হয়ে উঠেছে; আন্দোলনরত রাজনৈতিক শক্তির সভায় এসে সরকারের স্থানীয় প্রতিনিধিরা আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য প্রদর্শনসহ দল বদল করে নতুন সুরে কথা বলেছে, আন্দোলনে শহিদ হয়েছে এমন পরিবারে আত্মীয়তা স্থাপন করে পুরনো কালিমা মুছে ফেলার চেষ্টা করেছে।

ফুকোর আধুনিক ক্ষমতাতত্ত্ব অনুযায়ী, সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়াসও এ উপন্যাসে লক্ষণীয়। খিজিরের প্রতি নবজাগ্রত পাড়া-সর্দার আলাউদ্দিনের ব্যবহারে কিংবা গ্রামে জালাল মাস্টারের আচরণে দৈহিক পীড়নের পরিবর্তে মানসিক পরিমার্জনা সৃষ্টির লক্ষ্য স্পষ্ট। সেটা ওসমানের অসুস্থতার ক্ষেত্রে বন্ধুদের ব্যবহারেও লভ্য। ফুকোর দ্বিতীয় চিন্তাটি– যেখানে তিনি বলেছেন, ক্ষমতা ছড়িয়ে আছে সমাজের সর্বত্র– এ উপন্যাসের ক্ষেত্রেও বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। এ উপন্যাসেও আমরা লক্ষ করব,

রাষ্ট্রীয়-রাজনৈতিক ক্ষমতাবৃত্তের বাইরেও সমাজে বিদ্যমান বহুকেন্দ্রিক ক্ষমতার উৎস; পরিবারবলয় থেকে শুরু করে ক্ষমতার অসংখ্য কেন্দ্র বিরাজমান। বাড়িওয়ালা-ভাড়াটে, বস্তিমালিক-বস্তিবাসী, গৃহমালিক-পরিচারিকা, রিকশামালিক-রিকশাওয়ালা, শ্রমজীবী-কালোবাজারি, স্বামী-স্ত্রী, সৎপিতা-সন্তান, গুণ্ডাছাত্র-আমলাস্ত্রী প্রভৃতি বিচিত্রমুখী ক্ষমতার দ্বন্দ্ব উপন্যাসের জমিনকে করেছে রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত। ক্ষমতার প্রয়োগ ও প্রদর্শনের এসব পরিচিত ও প্রচলিত কাঠামোর বাইরেও লেখক নিজ অভিজ্ঞতা থেকে চিত্রিত করেছেন আরো কিছু প্রবণতার চিত্র। রহমতউল্লা যেখানে বিত্তবৈভব ও ক্ষমতার দাপট দেখায় পুলিশ-ভাড়াটে-রিকশাওয়ালা-বস্তিবাসী সকলের ওপর, সেখানে সে গৃহপরিচারিকার সঙ্গে অনৈতিক আচরণের জন্য ভয়ে কেঁচো হয়ে থাকে অভিজাত পরিবার থেকে-আসা নিজ স্ত্রীর মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিত্বের কাছে। একই চরিত্রের কাছ থেকে ক্ষমতাকেন্দ্রিক অবস্থানের ভিন্নতার কারণে ভিন্ন ভিন্ন আচরণের পরিচয়ও আমরা সমাজে প্রতিনিয়ত লক্ষ করি। যে-ব্যক্তিটি তার ঊর্ধ্বতন অফিস-কর্মকর্তার ক্ষমতার সামনে সর্বদা কেঁচোসদৃশ, সে-পুরুষটিই নিজগৃহে ক্ষমতার কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত হয়ে স্ত্রী-সন্তানদের সামনে ব্যাঘ্রসদৃশ হুঙ্কার ছাড়ে।

এখন আমরা নিম্নবর্গের বস্তি-পরিবেশে ক্ষমতার একটি বিচিত্র রূপের ব্যাখ্যা করব। জুম্মনের মা হিসেবে পরিচিত খিজিরের স্ত্রী সর্দার রহমতউল্লার গৃহপরিচারিকা। তার প্রতি রহমতউল্লার অনৈতিক আকর্ষণে সে অনুভব করে ক্ষমতার স্পন্দন; ফলে স্বামী খিজিরের প্রতি শ্রদ্ধা-ভালোবাসাশূন্য তার হৃদয়। এই ক্ষমতাকেন্দ্রিক আসক্তির ফলে তার মধ্যে স্বামীসংক্রান্ত ধর্মকেন্দ্রিক মূল্যবোধের অভাবও তীব্র। নিজ উপার্জনক্ষমতা ও যৌবনদীপ্ত শরীরকাঠামোও কুদর্শন স্বামীর প্রতি তার মনোভাবকে তুচ্ছতায় মণ্ডিত করে। এক্ষেত্রে তার মনোভাব গঠনে সন্তানবাৎসল্যও পালন করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। পূর্বস্বামী কামরুদ্দিনের ঔরসজাত সন্তান জুম্মনকে আপন অধিকার ও মমতাবৃত্তের মধ্যে রাখাসহ তার ভবিষ্যৎ নির্মাণে রহমতউল্লার ক্ষমতাই হতে পারে একমাত্র সহায় এমন চিন্তাও রহমতউল্লার কাছে আত্মসমর্পণের ব্যাপারে তার নীতিবোধ বা সতীত্বকে করে তোলে মূল্যহীন। অথচ এই নারীর নিরস্তিত্ব চেতনাই একসময় তাকে শুদ্ধসত্তায় রূপান্তরিত করে তাকে করে তোলে অস্তিত্বময়, যখন তার গর্ভে আসে খিজিরের সন্তান। তখন সে গর্ভস্থ সন্তানের পিতা হিসেবে খিজিরের প্রতি অনুভব করে মমতার বন্ধন। অতঃপর রহমতউল্লা কিংবা পূর্বস্বামী কামরুদ্দিন কারো কথায়ই গর্ভস্থ সন্তানকে বিনষ্ট করতে সে সম্মত হয় না; আর তার কারণ নতুন মাতৃত্বের অনুভূতি, যা তার মধ্যে এক ধরনের ক্ষমতার জাগরণ ঘটায়, যা তাকে প্রলোভনমুক্ত হয়ে শক্তিমানদের অস্বীকার করার সাহস জোগায়। রাজসিংহাসন থেকে বস্তি পর্যন্ত ক্ষমতার এমন বিচিত্র কেন্দ্র, বৈশিষ্ট্য, রূপ ও অনুভূতিকে উপস্থাপন করে ইলিয়াস এ উপন্যাসকে নিঃসন্দেহে বিশিষ্ট ও সার্থক করে তুলেছেন।

বহুস্বরিকতা

এই উপন্যাসের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এর বহুস্বরিকতা। ফিওদর দস্তয়েভস্কির (১৮২১-৮১) উপন্যাস বিশ্লেষণসূত্রে রুশ চিন্তাবিদ মিখাইল বাখতিন (১৮৯৫-১৯৭৫) উদ্ঘাটন করেন এই বহুস্বরিকতা (পলিফোনি) বা স্বরের বহুত্ব (প্লুরালিটি অফ ভয়েসেস) বিষয়ক তত্ত্ব। তিনি লক্ষ করেন, প্রতিটি কণ্ঠস্বরই উপন্যাসের একেকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অংশ। চরিত্রের এই স্বর সবসময় যে ঔপন্যাসিকের চেতনাপ্রসূত তা নয়, বরং তা চেতনানিরপেক্ষ। প্রতিটি চরিত্রই স্বতন্ত্র চেতনার ধারক আর সেই চেতনাও জঙ্গম। চরিত্রের চেতনাগত এরূপ গতিশীল বৈশিষ্ট্যের কারণেই তারা আর লেখকের হাতের পুতুল থাকে না, হয়ে ওঠে স্বয়ম্ভর। তাদের নিজ নিজ কণ্ঠই প্রকাশ করে স্বতন্ত্র সব দৃষ্টিভঙ্গি, যে-দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে ওঠে তাদের ভিন্ন ভিন্ন আচরণের দ্যোতক। স্বতন্ত্র সব স্বরের বৈচিত্র্য নিয়ে এভাবে উপন্যাস হয়ে ওঠে বহুস্বরিক। (দ্র. লুনাচারস্কি, ১৯৯৬ : ১-৩)। উপন্যাসে অথরিয়াল ডিসকোর্সের সঙ্গে ক্যারেকটেরিয়াল ডিসকোর্সের পার্থক্য সম্বন্ধে এ কালের লেখকেরা খুবই সতর্ক থাকেন। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাষাগত কর্তৃত্ব দ্বারা তারা চরিত্রের মানস-পরিকল্পনা আচ্ছন্ন করেন না। ফলে চরিত্রের ভাষা লেখকের ভাষা থেকে প্রথমেই ভিন্ন মাত্রা অর্জন করে। এর পরের ধাপে আসে চরিত্রের বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্যকে রূপায়িত করার প্রয়াসের বিষয়টি। বাখতিনের চিন্তার সঙ্গে হুবহু মিল না হলেও ইলিয়াসের নিজস্ব ভঙ্গিতে বহুস্বরিকতা সৃষ্টির প্রচেষ্টাটি প্রশংসনীয়। বাইরে তীব্রতর আন্দোলন, সরকারি অফিসের ভেতরে নিষ্কর্মা কেরানি-অফিসারদের শুধু হাজিরা দিয়ে বাড়ি ফেরার তাড়াসহ নিচের সংলাপ-অংশটিতে ঘটেছে বিচিত্রমুখী চিন্তার প্রতিফলন :

> কেরানিরা নিজেদের সুপারিনটেন্ডেন্টদের টেবিলে ভীড় জমায়। একটু ভীতু টাইপেরগুলো প্যানপ্যান করে, 'যাই স্যর, আবার কখন কি হয়!' সবারই সমস্যার অন্ত নাই।
>
> 'আমার বাসা স্যর পুরা হাসপাতাল। ওয়াইফের গলা ফুলছে, মেয়েটার ব্লাড ডিসেন্ট্রি।'
>
> 'যাই স্যর। বায়তুল মোকাররমে আজ বড়ো গ্যাদারিং, স্টুডেন্ট লিডাররা বলবে। মিটিং না শুনলে প্যাটের ভাত হজম হয় না স্যর।' সুপারিনটেন্ডেন্টরা যায় যার যার অফিসের কামরায়।
>
> 'কেউ অফিস করতে চায় না স্যর। কি করি?'
>
> 'অফিস করি কি করে স্যর? পিয়নরা প্রাকটিক্যালি সবাই এ্যাবসেন্ট।'
>
> 'এইগুলিরে লইয়া স্যর বহুৎ বিপদ! আরে তগো চিন্তা কি? গুলি খাইয়া মরলে আইজ বাদে কাইল তগো বৌপোলাপানে দ্যাশে যাইবো, ধান বানবো, খ্যাতে কামলা খাটবো। তগো চিন্তা কি?'

'প্রব্লেম স্যর আমাদের। মিডল ক্লাসের আসতেও কাটে, যেতেও কাটে।'

'যাই স্যর। আমাদের এরিয়ায় কতগুলি খচ্চইরা পোলাপান আছে। পুলিশ দেখলেই চাক্কা মারবো। ইপিআর পুলিস ঢুইকা পড়লে মহল্লায় ঢোকাই মুশকিল অইবো। যাই স্যর।' (আখতারুজ্জামান, ২০০০ : ৩৩)

এই সংলাপগুচ্ছে অভিব্যক্ত হয়েছে কেরানিকুলের নানারূপ মনোভঙ্গি। অফিসকাজে ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা তাদের অধিকাংশেরই মজ্জাগত। আন্দোলনের পরিস্থিতি সেই প্রবণতাকে আরো যুক্তিসিদ্ধ করেছে। পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অফিসকেন্দ্রিক বাস্তবতাকে তারা কৈফিয়ত হিসেবে এখানে উপস্থাপন করেছে। এসব কৈফিয়তে বাস্তবতার সঙ্গে মিশেছে তাদের শ্রেণিগত চরিত্রবৈশিষ্ট্য; যা স্বার্থপরায়ণ, সংকীর্ণতাযুক্ত আর দায়িত্বপরায়ণতাবিমুখ। তবে এসব সংলাপে বহুস্বরসংগতির প্রকাশটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। একই শ্রেণিবৈশিষ্ট্যের ধারক ব্যক্তিকুলের এই বিচিত্র স্বরভঙ্গির সঙ্গে ইলিয়াস সৃষ্টি করেছেন বিভিন্ন স্তরের অফিসারবৃন্দের ভিন্ন ভিন্ন কণ্ঠস্বরেরও বাস্তবতা।

অফিসারদের সমস্যাও বড়ো জটিল। তাদের বসদের ঘরে নিজেদের কষ্টের কথা বলতে বলতে একেকজন নুয়ে নুয়ে পড়ে।

'আমার সিস্টার-ইন-ল লন্ডন যাচ্ছে, টুয়েন্টি থার্ডে ফ্লাইট। এখনো ফর্মালিটিজ ইনকমপ্লিট। টেলিফোনে কাউকে পাওয়া যায়!'

'আমার থার্ড ছেলেটা, হি হ্যাজ বিকাম এ প্রব্লেম চাইল্ড। আমি ঘরে না থাকলেই বেরিয়ে পড়বে। এইচ এস সি-তে স্টার মার্কস পেয়েছে, ফিজিক্সে এ্যাডমিশন নিলো, ইউনিভার্সিটি তো–'

আরেকজনের সমস্যা তার স্ত্রীর সঙ্গীত-প্রতিভা, 'গায়িকাকে বিয়ে করে আমার হয়েছে প্রব্লেম। এতো সেন্সেটিভ, নয়েজ হলেই রি-এ্যাক্ট করে, নার্ভাস ব্রেক-ডাউন হয়।'

বসেরা তাদের ওপরওয়ালাদের সঙ্গে এবং ওপরওয়ালারা অফিসের এক নম্বরের কামরার বিশাল টেবিলের চারদিক আলো করে বসে দেশ ও রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে।

'ক্যাওস কনফিউশন কন্টিনিউ করলে ফিউচার ইজ ভেরি ব্লিক। পলিটিক্স যাই থাক, নাথিং সাকসিডস উইদাউট ডিসিপ্লিন।'

'রিমোট কর্নারে ক্যাওস আরো বেশি।'

'এভরিবডি মাস্ট বি রিজনেবল। এ্যানার্কি শুড নেভার বি এ্যালাউড টু কন্টিনিউ ফর ইনডেফিনিট পিরিওড।'

'এখন গভর্মেন্টের দ্যাখা দরকার এই আনরিজনেবল পিপলকে কন্ট্রোল করতে পারে কে? হি এ্যান্ড হি শুড বি টেকন ইনটু কনফিডেন্স।' (আখতারুজ্জামান, ২০০০ : ৩৩-৩৪)

অফিসের কর্মকর্তাদের মধ্যে রয়েছে চার-পাঁচটি স্তরের বিভাজন। এই বিভাজনের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তাদের বক্তব্য উপস্থাপনের ভাষাভঙ্গিও ভিন্নতা অর্জন করে। ইংরেজি বলার প্রবণতাসূত্রেও এই ভিন্নতা লক্ষণীয়। যেমন নিচের দিকের কর্মকর্তারাও ইংরেজি বলতে চেষ্টা করে, কিন্তু তা থাকে শব্দ ব্যবহারের মধ্যে সীমিত, বাক্যগঠনে থাকে বাংলা রীতি। কর্মকর্তাদের পদমর্যাদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাক্যে ইংরেজির ব্যবহার বাড়তে থাকে। প্রথমে বিচ্ছিন্ন শব্দ থেকে তা বাক্যাংশে রূপ নেয় এবং শেষে পূর্ণ বাক্যে পরিণত হয়ে বাংলা বাক্যরীতির বিসর্জন ঘটিয়ে সম্পূর্ণ ইংরেজি বাক্যরীতিকে অনুসরণ করে। ইংরেজি বলার এই ধরন থেকে কর্মকর্তাদের পদমর্যাদার ক্রম-উচ্চতাও শনাক্ত করা সম্ভবপর। শুধু শব্দ থেকে বাক্যে রূপান্তরের মাধ্যমেই এটি ঘটে না, ঘটে উন্নত চিন্তার প্রকাশেও, ঘটে ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে সমগ্র দেশের স্বার্থসম্পর্কিত কিংবা সুষ্ঠুভাবে দেশ-পরিচালনাগত ভাবনায়ও। এক্ষেত্রে তাদের শ্রেণিস্তর অনুযায়ী শব্দ ব্যবহারের তাৎপর্যও লক্ষণীয়। জনগণের ন্যায়সংগত আন্দোলনকে তারা 'ক্যাওস' (গণ্ডগোল, বিশৃঙ্খলা) বা 'এ্যানার্কি' (নৈরাজ্য, অরাজকতা) বলে যে অভিহিত করছে তাতেই তাদের মনোভঙ্গির ক্ষমতালিপ্সু বৈশিষ্ট্যটি স্পষ্ট। অর্থাৎ ঔপন্যাসিক হিসেবে ইলিয়াস সচেতনভাবেই চরিত্রের শ্রেণিভেদ-স্তরভেদ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন ভাষারীতির আশ্রয় নিয়ে এভাবে বহুস্বরিকতার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন।

এর একটি উদাহরণ দেওয়া যায় আমজাদিয়া হোটেলে ছাত্রনেতা, শিক্ষক-বুদ্ধিজীবীদের আন্দোলন নিয়ে রাজনৈতিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-বিতর্কের পরিবেশ থেকে। বাইরে মিছিল-মিটিংয়ের মধ্যেই এই আলোচনায় পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ববঙ্গকে বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, সামরিক সবদিক থেকে ব্যাপকভাবে শোষণ ও বৈষম্যের জাঁতাকলে পিষ্ট করার তথ্যসমর্থিত যুক্তি যখন উত্থাপিত হচ্ছে তখনই সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে দুই ছাত্রীর প্রবেশ ঘটে। এই সিরিয়াস রাজনৈতিক আলোচনাকে ভেদ করে কারো কারো দৃষ্টি সেদিকে পতিত হলে পুরনো ছাত্রদের মনে আক্ষেপ ধূমায়িত হয়। সিকানদারের ভাষায় : 'আমাদের সময়ে ছেলেরা মেয়েদের সাথে কথা কইলেই ফাইন হইতো, প্রক্টর দেখতে পারলে হয়!' এই আফসোসের মধ্যেই অব্যাহত থাকে আলতাফের চড়া গলা : 'আমাদের একমাত্র প্রব্লেম, অন্তত এখন প্রথম ও প্রধান সমস্যা পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ।' এরই মধ্যে সিকানদারের কথার সূত্র ধরে শওকত বলে : '...ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে কোনো মেয়ের সঙ্গে কথা বললে তার রেপ্‌ড হওয়ার ফিলিং হতো।' সহপাঠিনীদের নরভীতির বর্ণনা সে সম্পূর্ণ করে এই বলে : 'ছেলেদের কথা শুনে আবার কনসিভ না করে – এই ভয়ে মেয়েরা তখন কন্ট্রাসেপটিভ ইউজ করতো।' (আখতারুজ্জামান, ২০০০ : ৩৭)। জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সংকটের এক গভীর আলোচনার মধ্যে

হালকা চালের রসিকতাপূর্ণ সংলাপের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে লেখক বহুস্বরিক বাস্তবতার পরিবেশটি নির্মাণ করে ঔপন্যাসিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

এই বহুস্বরিকতা শুধু ছাত্রনেতা-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী, অফিসের কেরানি-অফিসারকুলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তা ব্যাপ্ত হয়েছে পুরো উপন্যাসজুড়ে সকল শ্রেণিস্তরের চরিত্রের মধ্যে; একই শ্রেণিস্তরের অন্তর্ভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন মানুষের মধ্যেও। শুধু তাই না, ভিন্নতা ঘটেছে গ্রাম-শহরের মধ্যে, নারী-পুরুষের মধ্যেও। দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাবনার প্রকাশের মধ্য দিয়ে ভাষাভঙ্গি ভিন্নরূপ লাভ করেছে। রহমতউল্লা ও খিজিরের ভাষারীতি যেমন ভিন্ন, তেমনি রহমতউল্লা ও আলাউদ্দিনেরও। খয়বার গাজী ও চেংটুর মধ্যে ভাষাভঙ্গির ভিন্নতা ব্যাপক হলেও আফসার গাজীর সঙ্গেও কম ভিন্নতা নেই। আবার ওসমান ও আনোয়ারের মধ্যে রাজনৈতিক চিন্তার ও মধ্যবিত্তের স্তরগত ঐক্য থাকলেও অর্থনৈতিক অবস্থানগত ভিন্নতাবশত দুজনের ভাষাভঙ্গিতে ঘটেছে বিস্তর পার্থক্য। একই বামপন্থি চিন্তার ধারক আনোয়ার আর আলিবক্সের মধ্যে শহর-গ্রামের ভিন্নতা ছাড়াও রয়েছে আন্দোলনের প্রায়োগিক রূপগত চিন্তার ব্যবধান, যা তাদের ভাষারীতিকে পৃথক করে তুলেছে। পচার বাপ আর করমালির ভাষায় ভিন্নতা এনেছে তাদের জীবনদৃষ্টিগত পার্থক্য। একই ঘটনা ঘটেছে খিজির ও বজলুর মধ্যে, একই বস্তিতে পাশাপাশি অবস্থান সত্ত্বেও। বজলুর বউ ও জুম্মনের মার ভাষাপ্রকাশেও দূরত্ব সূচিত হয়েছে এই জীবনভাবনার পার্থক্যের কারণে। খিজির ও জুম্মনের মার ক্ষেত্রেও যেটি অনিবার্যভাবে সত্য। পুরনো ঢাকার অশ্লীলতামণ্ডিত আঞ্চলিক ভাষাভঙ্গির সৃষ্টিশীল প্রয়োগের বিষয়টিও এক্ষেত্রে স্মরণীয়। ওসমান আর রানুর মধ্যে পারস্পরিক অনুরাগ সত্ত্বেও সেই অনুরাগ প্রকাশের ভাষায় ভিন্নতা সূচিত হয়; দুজনের ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক শিক্ষার কারণে। মামাতো বোন সিতারাকে বিয়ের লক্ষ্যে তার প্রতি যে অনুরাগ প্রকাশ করে আলাউদ্দিন তার ভাষারীতি ওসমানের থেকে সম্পূর্ণত পৃথক। এভাবে লেখক এ উপন্যাসের বহুস্বরিক বৈশিষ্ট্যকে করে তুলেছেন অনুভববেদ্য, নিবিড় ও সার্থক। তিনি প্রতিটি চরিত্রকে তার নিজ নিজ শ্রেণিগত অবস্থান, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী প্রাণবন্তরূপে নির্মাণ করতে গিয়ে তাদের মনোজগৎ-নির্ভর উচ্চারণকে বৈচিত্র্যময় ভাষারূপ দান করেছেন। ফলে তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলো মূললগ্ন হয়ে নিজ নিজ ভাষাকাঠামোয় স্বাতন্ত্র্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। এভাবেই ইলিয়াসের উপন্যাসে বহুস্বরিক বৈশিষ্ট্য স্বকীয়তা অর্জন করেছে।

কার্নিভাল তত্ত্ব

বাখতিনের আরেক আবিষ্কার কার্নিভাল তত্ত্ব। উপন্যাস বিশ্লেষণে মনোযোগী হয়ে তিনি এর মধ্যে উদ্ভাবন করেন কার্নিভালাইজেশনের স্বরূপ। তাঁর এই কার্নিভাল তত্ত্ব অনুযায়ীও ইলিয়াসের উপন্যাস বিচার করা সম্ভব। বাখতিন লক্ষ করেন, কার্নিভালে যেমন জনগণ একাকার হয়ে যায়, তাদের মধ্যে উচ্চ-নীচ, অভিজাত-অনভিজাত,

ব্রাহ্মণ-শূদ্র, ধনী-দরিদ্র, উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গ কোনো ভেদই আর অবশিষ্ট থাকে না, তেমনি উপন্যাসের কাঠামোয়ও কখনো কখনো এরূপ সাম্যাবস্থার সৃষ্টি হয়, যাতে কোনো একটি চরিত্রের ওপর অতিমাত্রায় আলো ফেলে তাকে নায়ক বা বীরের মর্যাদা দেওয়ার পরিবর্তে সকল চরিত্রই সমান মনোযোগ দাবি করে বসে। কার্নিভালের বৈশিষ্ট্য হলো, সেখানে রাস্তায় কিংবা বাজারের মাঝখানে অনুষ্ঠিত উৎসবে কয়েকদিনের জন্য হলেও মানুষ সকল ভেদাভেদ কিংবা নিজ নিজ সামাজিক অবস্থান ভুলে পারস্পরিক সম্পর্কে মিলিত হয়। সেখানে সবাই অভিনেতা, একই সঙ্গে সবাই দ্রষ্টা ও স্রষ্টা। 'কার্নিভালের জগতের সঙ্গে যুক্ত হয় মানুষের মুক্তির প্রয়াস, যা সাধিত হয় জীবনের মধ্যে এবং অন্যান্য মানুষের সংস্পর্শে। বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন স্তরে সবরকম ভয় এবং বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে সেখানে মানুষ জীবনের প্রাচুর্যকে বরণ করে।' (শুভা, ১৯৯৬ : ৩০) কার্নিভাল এমন এক অনুষ্ঠান যেখানে অনুষ্ঠানকারী, রঙ্গমঞ্চ, পাদপ্রদীপের আলো এবং দর্শক এর মধ্যে কোনো ভেদ থাকে না। প্রত্যেকেই হয়ে ওঠে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী; ফলে পরস্পরের মধ্যে বিনিময় ঘটে চিন্তাভাবনা-আবেগ-অনুভূতির। কার্নিভালগত জীবনার্থের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, এতে জনসাধারণের মধ্যেকার সব রকমের দূরত্ব লোপ পেয়ে তাদের মধ্যে কার্যকর হয়ে ওঠে স্বাধীন, অবাধ ও অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। (দ্র. নরেন্দ্রনাথ, ১৯৯৬ : ৫৮-৫৯)। আসলে কার্নিভাল সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, প্রথমত তা কর্তৃত্ববাদী চেতনাকে অস্বীকার করে; দ্বিতীয়ত, সামাজিক ক্রমোচ্চতার ধারণাকে বিপরীতমুখী করে; এবং শেষ পর্যন্ত, সামাজিক স্তরসমূহের বিচিত্র কণ্ঠস্বরকে একত্রীভূত করে।

বাখতিনের কার্নিভাল তত্ত্ব অনুযায়ী, আমরা যদি *চিলেকোঠার সেপাই* উপন্যাসের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব, এখানে কোনো কর্তৃত্ববাদী চেতনা অস্তিত্বশীল নয়। উনসত্তরের গণআন্দোলনের মূলে সক্রিয় অনেকগুলো চেতনা এ উপন্যাসে পরস্পর জড়াজড়ি করে আছে, জনমনে বিস্তৃত ও ব্যাপক হয়ে আছে। ইয়াসিন, আলাউদ্দিন, ওসমান, আলতাফ, আনোয়ার, শওকত, সিকানদার, ইফতিখার, খালেদ, আলিবক্স, খিজির ও চেংটু প্রতিটি চরিত্র আন্দোলনে সক্রিয় হলেও নিরংকুশভাবে একই চেতনার ধারক-বাহক নয়। প্রত্যেকে তার নিজ নিজ বিচার-বিবেচনা-শিক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী আন্দোলন সম্বন্ধে একেকটি চেতনাকে ধারণ ও লালন করে এবং সেই অনুযায়ী অগ্রসর ও সক্রিয় হয়। চেতনার এই বিচিত্রতা ও একই সঙ্গে সংযুক্তি ও সংশ্লেষ প্রভৃতি বিশাল সংগ্রামস্রোতে একীভূত হলে সমগ্র দেশে গণজাগরণ সৃষ্টি অনিবার্য হয়ে ওঠে।

এভাবে আমরা এ উপন্যাসে চেতনার কর্তৃত্ববাদী রূপের অনুপস্থিতি যেমন লক্ষ করি তেমনি লক্ষ করি সামাজিক ক্রমোচ্চতার বিপরীত ধারণাটিও অর্থাৎ তার উল্টোমুখী গতি। এই আন্দোলন ক্ষমতার কেন্দ্রিকতাকে যেহেতু ভেঙে দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ সেহেতু সামাজিক বিন্যাসে পিরামিডসদৃশ কোনো কাঠামো সৃষ্টির প্রশ্নকেই অবান্তর করে

তোলে। কার্নিভাল উৎসবের প্রধান প্রবণতাটির কথা এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়, যেখানে সকলের উপস্থিতিতে সৃষ্টি হয় ভেদাভেদহীন, উচ্চ-নীচের ভাবমুক্ত এক সমমর্যাদার অনুভূতি, সেখানে কারো পক্ষে বা কোনো অংশের পক্ষে বিশেষরূপে বৃহৎ হয়ে ওঠার সুযোগ রহিত হয়ে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য কোনো সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাসের কথা। এক্ষেত্রে প্রথমেই চোখ পড়বে টলস্টয়ের *ওয়ার অ্যান্ড পিসের* দিকে। সেই ঐতিহাসিক যুদ্ধক্ষেত্রের যে চিত্র টলস্টয় এঁকেছেন তাতে সম্রাট নেপোলিয়ন কিংবা সেনাপতি কূটজভ কাউকেই বীর বলে আলাদা করে শনাক্ত করার উপায় নেই; উভয়েই সমগ্র সেনামণ্ডলীর সঙ্গে একাকার হয়ে গেছেন। ওয়াইড লেন্সের ক্যামেরা দিয়ে দূর থেকে কোনো জনসভার ছবি তুলতে গেলে যেমন বক্তা ও শ্রোতা একাকার হয়ে পড়েন ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রেও অনেকটা তাই ঘটে। দূর অতীতের ইতিহাসকে আমরা দেখছি ওয়াইড লেন্সের ক্যামেরায়। এরূপ দেখার বৈশিষ্ট্যটি এ উপন্যাসের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

আমরা ইতিহাসে উনসত্তরের গণআন্দোলনের নায়ক হিসেবে বঙ্গবন্ধুকে পাই। উপন্যাসেও স্বীকার করা হয়েছে 'শেখ সাহেব সবচেয়ে পপুলার নেতা, দেয়ার ইজ নো ডাউট এ্যাবাউট ইট' বলে। (আখতরুজ্জামান, ২০০০ : ২২৫) কিন্তু এ উপন্যাসে সবকিছুকে ছাপিয়ে তিনি বড় হয়ে ওঠেননি। এর কারণ তাঁর প্রতি লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির কোনো সমস্যা নয়। এর কারণ, উপন্যাস নামক প্রকরণের শিল্পগত বাস্তবতা। একজন মহৎ ঔপন্যাসিকের পক্ষে এই বাস্তবতাকে উপেক্ষা করা অসম্ভব। ইতিহাসের যিনি নির্মাতা তিনিও হয়ে ওঠেন ইতিহাসেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। সেই অংশটি সমগ্র থেকে আলাদা কিছু নয়। সমগ্রের সঙ্গে তিনিও মিশে গেছেন। এই যে একাকার হয়ে যাওয়া এটা কার্নিভালেরই বৈশিষ্ট্য। এর সবচেয়ে উত্তম দৃষ্টান্ত হয়ে আছে এই আন্দোলনের সবচেয়ে শীর্ষ মুহূর্ত অর্থাৎ ২৪ জানুয়ারির মিছিলটি। তারিখের উল্লেখ উপন্যাসে নেই, যা আছে তাও বিভ্রান্তিকর, মূলত ব্যঞ্জনাময়; কিন্তু সচেতন পাঠক বুঝতে পারেন এই দিনটির চিত্রই আঁকা হয়েছে ওই বাঁধভাঙা মিছিলের অনিঃশেষ যাত্রার বিবরণে। উপন্যাসের ২১ সংখ্যক পরিচ্ছেদের বর্ণনার কিছু অংশ :

> ...মানুষের আর শেষ দেখা যায় না। ওসমান প্রথমে তাকায় উত্তরে। কালো কালো হাজার হাজার মাথা এগিয়ে আসছে অখণ্ড স্রোতধারার মতো। এই বিপুল স্রোতের মধ্যে ঘাইমারা রুইকাতলার ঝাঁক নিয়ে গর্জন করতে করতে এগিয়ে আসছে কোটি ঢেউয়ের দল। দক্ষিণে তাকালেও দেখা যায় এই স্রোতধারা কেবল এগিয়ে যাচ্ছে সামনে দিকে।... উত্তর থেকে আসে বরফ-গলা শহরের স্রোত, উপচে উঠে মানুষ গড়িয়ে পড়ছে পাশের গলিতে উপগলিতে। গলি-উপগলি ভরা কেবল মানুষ, দুই পাশের বাড়িগুলোর ছাদ পর্যন্ত মানুষ। গলি-উপগলি থেকে স্রোত এসে মেশে মূলধারার সঙ্গে, মানুষ বাড়ে, নবাবপুর সামলাতে পারে না, মানুষের প্রবাহ ফের

গড়িয়ে পড়ে পাশের ফাঁকা গলিতে। ফাঁকা গলি কি আর আছে? সব জায়গা কানায় কানায় ভরা। ঢাকায় কি এতো লোক বাস করে?..

বেলা গড়ায়। বুড়িগঙ্গার পাশাপাশি ইসলামপুর ধরে আরেকটি স্রোতধারা বইছে। চাপা রাস্তায় অকুলান হয় বলে উঁচু উঁচু বাড়ির মাথা থেকে পা পর্যন্ত থৈ থৈ করে মানুষ, কেবল মানুষের পাক, মানুষের ঢেউ।

বাবুবাজার পৌঁছে শওকত বলে, 'চলেন কিছু খেয়ে নিই। সোয়া তিনটে বেজে গেছে।'...

'আরে আমরা খেতে খেতে মিছিল আর কতোদূর যাবে? এতো বড়ো মিছিল, এর শেষ মাথা আসার আগেই আমাদের খাওয়া শেষ হয়ে যাবে।' (আখতারুজ্জামান, ২০০০ : ১৪৮-৫০)

এই যে ঢাকার মানুষ সব প্রতিবাদী হয়ে রাজপথে নেমে যায় তার মধ্য দিয়েই সংগঠিত হয় গণঅভ্যুত্থান। মিছিলের এই মানুষ আসলে কার্নিভালের মানুষ; বড়ো-ছোটোর ভেদহীন, নেতা-জনতার ভিন্নতাহীন, মুক্তিকামী আনন্দমুখর একই সমান্তরালের মানুষ। যে মানুষ শুধু বর্তমানের মানুষ না, লেখক ওসমান-চরিত্রের কল্পনাধৃত প্রেক্ষণবিন্দু থেকে ওরই মধ্যে আবিষ্কার করেন বাংলার অতীতকালের সকল বিদ্রোহী জনতাকে। মানুষের এই অফুরন্ত শক্তিই অভ্যুত্থানে রূপ নিয়ে লৌহমানবকে ধরাশায়ী করে। ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি সমষ্টিগত মানুষের এই অপার শক্তির অনিঃশেষ রূপ আর সৌন্দর্যের দিকে, ব্যক্তির অস্বাভাবিক ক্ষমতার দিকে নয়। এভাবেই কার্নিভালের বৈশিষ্ট্যব্যঞ্জক একটি দিক মূর্ত হয়ে উঠে উপন্যাসটিকে সার্থক করে তুলেছে। আরো একটি বিষয় এখানে লক্ষণীয়। তা হলো, এ-উপন্যাসে উনিশ শতকীয় মানদণ্ড অনুযায়ী, নায়ক-চরিত্রে বীরত্বব্যঞ্জকতার শিরস্ত্রাণ না-পরিয়ে বরং বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালীন বিশ শতকীয় আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে অ্যান্টি-হিরোর ধারণাকেই লেখক পরিব্যাপ্ত করে তোলেন।

অন্যদিকে, সম্মিলিত মানুষের এই বিপুল শক্তি প্রসঙ্গেই স্মরণীয়, লেখক এখানে যে মেগান্যারেটিভ সৃষ্টি করেন তা উত্তর-আধুনিক জ্ঞানকাণ্ডের বিপরীত চিন্তাকেই প্রতিষ্ঠা করে। উত্তর-আধুনিক জ্ঞানভাষ্যে বলা হয়ে থাকে, মানুষের প্রতিবাদ-বিদ্রোহ খণ্ড-বিচ্ছিন্ন ধারায়ই পর্যবসিত হবে; সর্বদা তার রূপ হবে প্রান্তিক; কেন্দ্রে কখনো সংঘটিত হলেও তার চারিত্র্য প্রান্তিকই থাকবে; কেন্দ্রাভিমুখী সমগ্রতায় স্পন্দিত হয়ে বিপ্লবাত্মক রূপ গ্রহণ করবে না। কিন্তু এ উপন্যাসের দিকে তাকালে আমরা নিশ্চিতভাবে দেখতে পাই, দেশের কেন্দ্র থেকে সকল প্রান্ত পর্যন্ত ব্যাপ্ত এ আন্দোলন সমগ্রতাস্পন্দী হয়ে কেন্দ্রাভিমুখী প্রবল অভিঘাত সৃষ্টি করে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনসাধনে বদ্ধপরিকর। লেখক সকল সর্বসাম্প্রতিক চিন্তার সঙ্গে পরিচিত থেকেও এখানে উনসত্তরের বাস্তবতার প্রতি অনুগত থেকেছেন, পরিচয় দিয়েছেন কথাশিল্পী হিসেবে সততার।

চেতনাপ্রবাহ রীতি

উপন্যাসের বয়ানে বা বাচনভঙ্গিতে স্ট্রিম অফ কনশাসনেস নামক বিশ শতকীয় আধুনিক রীতির অনুসরণ করে লেখক অসাধারণ দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। সাহিত্যে এই রীতি প্রচলনের সঙ্গে বিশ শতকের শুরুতে সিগমুন্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯) কর্তৃক মানবমনের দ্বিস্তর-সম্পর্কিত আবিষ্কার ও তার স্বরূপ ব্যাখ্যার রয়েছে অনিবার্যভাবে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। *The Unconcious* (১৯১৫) গ্রন্থে তিনি মনের অচেতন-অবচেতনের এমন ব্যাখ্যা তুলে ধরেন যা এতদিন ছিল অনাবিষ্কৃত। মানবমনের সচেতন স্তরের বাইরে যে এক বিশাল সীমা-পরিসীমাহীন রহস্যাবৃত অঞ্চল বিদ্যমান তা শুধু আবিষ্কারেই ক্ষান্ত থাকেননি তিনি, ওই রহস্যের অন্তর্গত বৈশিষ্ট্য উন্মোচনেও সার্থকতা দেখিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর আরো তিনটি বইয়ের নাম উল্লেখযোগ্য : *The Interpretation of Dreams* (১৯০০), *Introductory Lectures on Psycho-Analysis* (১৯১৭) ও *The Igo and the Id* (১৯২৩)। চেতনাপ্রবাহ রীতিটি কথাশিল্প ও কবিতায় অনুসৃত হওয়ার মূলে এসব বইয়ের প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে। মনের অবচেতন-অচেতন সম্পর্কিত ধারণা, অবদমন, স্বপ্ন-ব্যাখ্যা প্রভৃতি সূত্রে সাহিত্যে অন্তর্বাস্তবতার উন্মোচনে এবং বয়ানভঙ্গিতে চেতনাপ্রবাহ রীতি-অনুসরণে লেখকেরা আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ফলে কথাসাহিত্যে বহির্বাস্তবের পরিসর ক্রমশ সংকুচিত হয়ে পড়ে। কালের পারম্পর্য ভেঙে মনোজাগতিক কল্পনাপ্রবাহকে মান্য করে প্রাধান্য পায় উল্লম্ফন রীতি। একই সঙ্গে ভেঙে যায় স্থান ও কালপরিসরের বিস্তৃতির ধারণা। সাংলাপিক বাস্তবতার পরিবর্তে আত্মকথন রীতির অনুপ্রবেশ ঘটে; সেই সঙ্গে বিস্তৃত হয় কল্পনাধর্মিতা, স্বপ্নচারিতা ও স্মৃতিময়তা। এভাবে উপন্যাসে মনোবিশ্লেষণধর্মিতা যেমন প্রাধান্য পেতে থাকে তেমনি সর্বাংশে মনোবিশ্লেষণাত্মক উপন্যাস রচনারও বিস্তৃতি ঘটে। আর সেই সূত্রে বয়ানকৌশলে অনুপ্রবেশ ঘটে চেতনাপ্রবাহ রীতির। বাংলা উপন্যাসে এই রীতির ধারক হিসেবে উল্লেখযোগ্য ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৬১), গোপাল হালদার (১৯০২-৯৩), সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-৬৫), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-৭১) প্রমুখ।

ইলিয়াসের *চিলেকোঠার সেপাই* একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত; বহির্বাস্তবতার চিত্র এখানে অনিবার্যভাবেই প্রধান; সুতরাং একে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস বলার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু সমগ্র উপন্যাস জুড়েই মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের প্রয়াস লক্ষণীয়। ব্যক্তির মনস্তত্ত্বের পাশাপাশি বিশ্লেষিত হয়েছে সমাজ-মনস্তত্ত্ব। আর সেই প্রয়াসেরই অনিবার্য বাহন হিসেবে অনুসৃত হয়েছে চেতনাপ্রবাহ রীতি। উপন্যাসটির শুরুই হয়েছে একটি স্বপ্নদর্শনের বাস্তবতা নিয়ে। ওসমানের পিতৃমৃত্যুবিষয়ক স্বপ্নের জমিনে মায়ের আহাজারি, ঢাকায় ঘুমিয়ে-থাকা ওসমানের স্বপ্নের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বাড়িতে উপস্থিতি, মৃতদেহ নিয়ে সমাধিস্থলের দিকে

গমনরত অবস্থায় ছিটানো গোলাপজলের স্পর্শ আর বাস্তবে জানালা দিয়ে বৃষ্টির ছাঁট এসে পায়ে পড়লে তার ঘুম ভেঙে যাওয়া এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ভবনের দোতলা থেকে একটি মৃত্যুসংবাদ নিয়ে তাকে ডাকতে আসা প্রভৃতির মধ্যে এক ধরনের কাকতালীয় ও কার্যকারণ সূত্র দুই-ই বিদ্যমান। এই যে মনের অচেতন-অবচেতনের সঙ্গে বা স্বপ্নক্রিয়ার সঙ্গে বাস্তবের মেলবন্ধন ঘটানোর সচেতন কল্পনাধৃত প্রয়াস– এসবের মধ্যেই আমরা লক্ষ করি ইলিয়াসের মানবমনের অচেতন অংশকে অনুধাবনের এক নিষ্ঠাবান স্বতন্ত্র রূপ। মনের গভীর থেকে গভীরতর স্তরের মধ্যে প্রবেশের এক নিরবচ্ছিন্ন, যুক্তিগ্রাহ্য ও সৃষ্টিশীল অধ্যবসায় এই স্বাতন্ত্র্যের নিশ্চিত জনক। পুরো উপন্যাস জুড়ে চেতনাপ্রবাহ রীতি অনুসরণের ক্ষেত্রে লেখকের এই স্বকীয়তা আমাদের বিমুগ্ধ ও বিস্মিত করে।

দোতলার আহ্বানে সাড়া দিয়ে শহিদের গৃহে পৌঁছেও ওসমানের মনোজগৎ চেতন-অচেতনের ক্রিয়াশীলতায় দ্বন্দ্বময়। 'ওসমানের শরীরের রক্তপ্রবাহ তার করোটির ছাদে উদ্বন্ধনে ঝোলে।'– এই বাক্যের মধ্যেই তার অন্তর্গত দ্বন্দ্বমুখর পরিবেশটি চিত্রময় হয়ে ওঠে। লেখকের পরবর্তী বর্ণনায় এটি আরো স্পষ্ট হয় যখন সে 'একনিষ্ঠ মনোযোগী' হয়ে ঘরের সিলিংয়ের নিচে দেওয়ালে গাঁথা গুলিবিদ্ধ একটি যুবককে দেখতে পায়। ৩০৩ রাইফেলের একটি গুলি যুবককে গেঁথে রেখেছে দেওয়ালের সঙ্গে। যুবকের হাঁ-করা মুখে জমে আছে প্রচণ্ড একটি চিৎকার, যে কোনো সময় দালান ফাটিয়ে যা বেরিয়ে আসতে পারে। (আখতারুজ্জামান, ২০০০ : ১৮) দেওয়ালে-গাঁথা যুবককে দেখতে পাওয়া এবং তার-সম্পর্কিত উপলব্ধির পুরোটাই ওসমানের অচেতন মনের তীব্র অভিনিবেশি চিন্তনক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্ট বিভ্রম। লেখক এই আনকনশাসের ইলিউশনকে এখানে চিত্ররূপ দিয়েছেন কেবল। স্বপ্ন ও বাস্তব, তন্দ্রা ও জাগরণ, অচেতন ও চেতনের মধ্যেকার এই ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কের আরেকটি চমৎকার দৃষ্টান্ত হতে পারে করমালির নিম্নোক্ত ঘটনাটি। বগুড়ার গ্রামের হতদরিদ্র কৃষক করমালি তখন ঢাকায় ওসমানের চিলেকোঠায় :

> সকালবেলা মেঝেতে বসে এইসব ভাবতে ভাবতে করমালির চোখ জড়িয়ে আসছিলো। দ্যাখে কি, চেংটুর সঙ্গে সে হেঁটে চলেছে কোন নতুন চরের ভেতর দিয়ে। শীতকালের সর-পরা যমুনায় বুদবুদ উঠছে। চেংটু বলছে, 'একটা খাপি জাল হলে পাঙাস ধরা গেলোনি রে!' যমুনার ভেতর থেকে বড়ো পাঙাস ঘাই মারে। ঘাই মারার শব্দে তন্দ্রা ছিঁড়ে গেলে করমালি দ্যাখে, ওসমান খুব শব্দ করে হাই তুলছে। (আখতারুজ্জামান, ২০০০ : ৩১২)

কোথায় পুরনো ঢাকার একটি চিলেকোঠা, সেখান থেকে মৌহূর্তিক তন্দ্রার মধ্যে চলে যাওয়া যমুনার চরে, সেখানে মৃত চেংটুর সঙ্গে পাঙাস ধরার পরিকল্পনা। অন্যদিকে অচেতনে অনুভূত যমুনায় পাঙাসের ঘাই মারার শব্দের সঙ্গে বাস্তবে ওসমানের হাই তোলার শব্দ একাকার করে তন্দ্রা ছুটে যাওয়ার পুরো কল্পনা ও তার বিন্যাসের মধ্যে

লেখকের উন্নত মনস্তাত্ত্বিক উপলব্ধির নিবিড় পরিচয়টি বিধৃত। লেখক মানবমনের চেতন-অচেতনের সম্পর্কসূত্রকে গভীর অভিনিবেশসহকারে শুধু পাঠ করেননি, এর সঙ্গে তিনি যুক্ত করেছেন কার্যকারণসূত্রসমন্বিত তাঁর অসামান্য সৃষ্টিশীল অভিজ্ঞানকে। আমরা এর সঙ্গে গুলিবিদ্ধ খিজিরের মৃত্যুদৃশ্যের বর্ণনার দিকে যদি তাকাই তাহলে লেখকের কল্পনাগত ঐশ্বর্যের অতুলনীয় উদাহরণের মুখোমুখি হয়ে বিস্ময়ে হতবাক হই। রাতে কারফিউ ভঙ্গ করে মিছিল করতে নেমে গুলিবিদ্ধ হয়ে খিজির পড়ে যায় ফুটপাতঘেঁষা রাস্তায়, চোখের সামনে কালচে হলুদ আলো মিলিয়ে গিয়ে অন্ধকার গাঢ়তর হয়। ট্রাক তাকে ধাক্কা দিয়েছে মনে করে ড্রাইভারের উদ্দেশে গালাগাল দিলেও তার মুখ থেকে উচ্চারিত হয় না কোনো শব্দ। গাঢ়তর অন্ধকারের অনুভূতির পটভূমিতে লেখকের ভাষায় তার অচেতনলোকের ভাবনারাশি :

> সারা মহল্লায় কি কারেন্ট চলে গেছে? কিন্তু যতই কারেন্ট যাক, এখন কি তার এমনি শুয়ে থাকবার সময়? হায়রে, সবাই বুঝি পৌঁছে গেছে ক্যান্টনমেন্টের গেটে, আর সে হালায় খোমাখান ভ্যাটকাইয়া পইড়া থকে ভিক্টোরিয়া পার্কের সামনে। কি হলো? তার বডির চেসিস কি ভেঙে গেলো? তার টায়ারে কি হাওয়া নাই? নতুন টায়ার কি ফেঁসে গেলো নাকি? আবার দ্যাখো, ঘাড়ে, বুকে ও পেটে পানি গড়িয়ে পড়ে! পানি ভি আরম্ভ হইলো! এ্যাঘ নাই, বাদলা নাই, পানি হয় ক্যামনে? মাথাটা তার পড়ে রয়েছে ড্রেনের মধ্যে, তাই কি উঠতে পাচ্ছে না? ... দেওয়ালের বেতর কৃষ্ণচূড়া ডালের ঝাঁকড়া মাথায় শুয়েছিলো ল্যাম্পোস্টের আলো। দেখতে দেখতে তাও নিভে গেলো। এবা ঝাপসা আলো জ্বলে চোখের ভেতরকার কালো মণিতে। সেই আলোতে দোলে রোকনপুর, লক্ষ্মীবাজার, শ্যামবাজার, বাঙলাবাজার, সদরঘাট, সূত্রাপুর, ফরাশগঞ্জ, এমন কি গ্যাণ্ডারিয়া ফরিদাবাদ পর্যন্ত। দোলানো ঘোরানো সেইসব মহল্লার রাস্তায় রাস্তায়, গলিতে গলিতে, উপগলি-শাখাগলিতে খিজির প্যাডেল ঘোরায়। তার সামনে হেঁটে যাচ্ছে জুম্মনের মা। কিছুতেই তার নাগাল পাওয়া যায় না... কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এভাবে এতো ঘোরার পর খিজির ফের গুলির আওয়াজ শুনতে পায়। এবার নিজের গতরটাকে বোধ করতে পারে সংঘাতিক ব্যথায়। বুঝতে পারে তার গোটা শরীর ভেসে যাচ্ছে রক্তে, – এতো রক্ত কোত্থেকে এলো? বন্ধ ও ক্লান্ত চোখের কম্পমান মণিতে গাঁথা হয় একটি সিঁড়ি, সিঁড়ির নিচে রক্তের ঢেউয়ে দোল খায় উলঙ্গ নারীদেহ।... রক্তের মধ্যে দোলে তার মায়ের কালোকিষ্টি গতরখান।... (আখতারুজ্জামান, ২০০০ : ২৭৭-৭৮)

মৃত্যুকালীন এই অচেতনের বর্ণনা বেশ দীর্ঘ। মুহূর্তের মধ্যে তার সারাজীবনটা এখানে আভাসিত হয়। স্ত্রীর গর্ভে তার সন্তান, স্ত্রীর ওপর রহমতউল্লার ভোগবাদী দৃষ্টি, মায়ের মৃত্যুকালীন সেই ভয়ংকর দৃশ্য, যার পেছনেও ছিল রহমতউল্লারই ব্যাভিচারি নিষ্ঠুরতা, আর সমগ্র জীবনের কষ্টকরতা – সব যেন দ্রুততার সঙ্গে দৃশ্যপটে হাজির হয়। এরূপ এক মৃত্যুকালীন মনোদৃশ্য অঙ্কিত হতে দেখি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *অপরাজিত* উপন্যাসে সর্বজয়ার ক্ষেত্রে। তার সারাজীবনটাও ছিল দারিদ্র্যের আঘাতে জর্জরিত।

একমাত্র পুত্রকে অবলম্বন করে সকল দুঃখ-কষ্ট সে ভুলেছিল। মৃত্যুকালে তার অচেতনে জাগ্রত হয়েছিল জীবনব্যাপী দুঃখের সঙ্গে পুত্রস্মৃতি আর মৃত্যুভীতি। চেতনাপ্রবাহ রীতি অনুসরণের ক্ষেত্রে ইলিয়াসের স্বকীয়তার আরেকটি দিক এখানে উল্লেখযোগ্য; যেটি ঘটেছে কাহিনিবিন্যাসের ক্ষেত্রে। অন্য লেখকের ক্ষেত্রে দেখি, চরিত্রের মনোজগতের চিন্তনক্রিয়ার মাধ্যমে কাহিনিবয়ানে তাঁরা প্রয়াসী হন। সেদিক থেকে ইলিয়াসের ব্যতিক্রমী দিকটি হলো, তাঁর বয়ানকৌশলটি একমাত্রিক বা একস্তরিক থাকে না, হয়ে ওঠে বহুমাত্রিক বা বহুস্তরিক।

যেমন, ইদের দিন সকালে খিজির গিয়েছিল রহমতউল্লার বাড়িতে, সেখানে আলাউদ্দিনের নির্দেশে সে গ্যারেজে গিয়ে রিকশাওয়ালাদের কাছে রিকশা বণ্টন করে, কিন্তু গ্যারেজ বন্ধ করতে গিয়ে বারবার শৈশবস্মৃতিতে আচ্ছন্ন হয়ে সেখানে ঘুমিয়ে পড়ে। পরে ফিরে এসে রহমতউল্লার বাড়ি থেকে ভাড়াটেদের জন্য খাবার বণ্টনে নিয়োজিত হয়ে সে শেষপর্যন্ত উপস্থিত হয় ওসমানের চিলেকোঠায়। সেখানে ওসমানের খাওয়ার জন্য অপেক্ষারত খিজিরের চেতনাপ্রবাহ থেকেই বর্ণিত হয় সকাল থেকে সংঘটিত সকল ঘটনা। চেতনাপ্রবাহের এটি তো স্বাভাবিক রীতি। কিন্তু এর বিশেষত্ব হলো, ওসমানের চিলেকোঠায় অবস্থানরত খিজিরের চেতনাপ্রবাহ থেকেই উদ্ঘাটিত হয় সকালে গ্যারেজে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে সে-সময়ে তার কল্পনাধৃত শৈশবের ঘটনারাশি, যার মধ্যে আছে তাঁর মায়ের অবৈধ গর্ভধারণ-উত্তর হাতুড়ে পদ্ধতির অ্যাবরশনের পরিণতিতে বিপুল রক্তপাতসহ করুণ মৃত্যুর দৃশ্য। অর্থাৎ গ্যারেজে অবস্থানরত তার কল্পনাবৃত্তে অনুরণিত শৈশবস্মৃতিও উন্মোচিত হলো ওসমানের চিলেকোঠায়। অর্থাৎ কল্পনার একটি স্তরের মধ্যে অবস্থান করে আরেকটি স্তরে অনুপ্রবেশ করার এই মুন্সিয়ানাটি একান্তভাবে ইলিয়াসেরই স্বকীয় উদ্ভাবন।

ভাষার ব্যঞ্জনা

ইলিয়াস তাঁর উপন্যাসে ব্যবহৃত ভাষাকে আভিধানিক অর্থকাঠামোর বাইরে নিয়ে গিয়ে নতুনতর ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত করার চেষ্টা করেছেন। ভাষা যে শুধু তথ্য প্রদান করে না, শুধু নিরীহ বর্ণনা-বিবরণে সীমাবদ্ধ থাকে না, ভিন্ন ভিন্ন পরিচর্যার পটভূমিতে তা হয়ে ওঠে কখনো প্রতীকী, কখনো নাটকীয়, কখনো চিত্রধর্মী, কখনো গীতময়, কখনো আবার মানবমনস্তত্ত্বের গভীরে গিয়ে আবেগ-অনুভূতি-স্মৃতিরাশিকে প্রতিচিত্রিত প্রতিবিম্বিত করারও একান্ত উপযোগী, লেখক তা জানতেন। ভাষার এই বিচিত্র শক্তি ও সৌন্দর্যকে ইলিয়াস তাঁর বহুমাত্রিক সৃষ্টিশীলতা দ্বারা অনুধাবন করেছেন এবং উপন্যাসের জমিনে তার যথাযথ প্রয়োগে যত্নবান হয়েছেন। একটি মৃত্যুর সংবাদ উপস্থাপনের শেষে চরিত্রটি সম্বন্ধে লেখকের বিশ্লেষণ : 'বাক্যের শেষদিকে তার গলা নোনা পানিতে ছলছল করে।' এ ধরনের ঘটনায় সাধারণত পাঠক-শ্রোতার চোখ ছলছল করে। একই

সঙ্গে আমাদের কণ্ঠও যে সিক্ত হয়, ভিজে যায়, সেটিকে অনুভবগ্রাহ্য করার জন্য চোখের দৃশ্যমান চিত্রকে গলার ওপর ন্যস্ত করেছেন। পরের বাক্যটি এরকম : 'তারপর প্রায় মিনিটখানেকের নীরবতা, পাশের কামরার দারোগা ও রহমতউল্লার নিচু স্বরের সংলাপে কিংবা মেয়েদের বিলাপে সেই নীরবতায় একটি ঢিলও পড়ে না।' (আখতারুজ্জামান, ২০০০ : ২০) কাহিনি-বর্ণনভঙ্গিতে ভাষাকে বিশেষ অর্থময় করে তোলার প্রচেষ্টাটি লক্ষণীয়। দুজনের নিচুস্বরের সংলাপ কিংবা মেয়েদের বিলাপে যে স্থিতাবস্থা তৈরি হয়েছে সেটি নীরবতার তুল্য মর্যাদায় উন্নীত। এর থেকে উচ্চস্বরের কোনো সংলাপই কেবল এই নীরবতাকে ভাঙতে পারে, যেটি ঢিলের সঙ্গে উপমিত। ঢিল যেমন শান্ত জলাশয়ে তরঙ্গ সৃষ্টি করে, শান্ত মৌমাছিকুলকে অশান্ত, উত্তেজিত ও গতিশীল করে তেমনি এই শান্ত স্থিতিশীল পরিবেশটিও ঢিলসদৃশ উচ্চস্বরের সংলাপের আঘাতে বিনষ্ট হতে পারে। লেখক এভাবে একটি উন্নত কল্পনামণ্ডিত, স্বকীয় অভিজ্ঞতাপ্রসূত উপমা সৃষ্টি করেছেন।

ভাষার এই ব্যঞ্জনাধর্মিতাকে লেখক আরো কত উচ্চতায় উন্নীত করেছেন তার আরেকটি দৃষ্টান্ত আমরা চয়ন করব উপন্যাসের শেষাংশ থেকে। মনোবিকারগ্রস্ত ওসমান তার পাশে শায়িত আনোয়ারকে ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে চিলেকোঠা থেকে বেরিয়ে যায়। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকার কারণে আনোয়ার টের পায় না ওসমানের পলায়ন প্রক্রিয়ার শব্দ। যাওয়ার সময় ঘরের বাতি নিবিয়ে দেওয়ার ফলেও নিবিড় হয়ে ওঠে আনোয়ারের ঘুম। লেখকের ভাষায় :

> ওসমান সুইচ অফ করে যাওয়ার পর পাতলা অন্ধকার ১টি কাঁথা হয়ে তার চোখমুখ ঢেকে দিয়েছে। ওপরে ওই অন্ধকার একটু পাতলা, কিন্তু তার চোখের ভেতরকার অন্ধকারকে এটা বেশ ঘন করে তোলে। অন্ধকার ক্রমে পুরু হয়, পুরুষ্টুও হয়। অন্ধকারে পড়ে অন্ধকারের ছায়া এবং ছায়া-অন্ধকার ঘনিয়ে আসে বৈরাগীর ভিটায়। চেংটুকে খুঁজতে গিয়ে সেখানে দ্যাখা মেলে জালাল মাস্টারের। বটগাছের পুরু শিকড়ে বসে জালালউদ্দিন বৈরাগীর ভিটার নতুন মহিমা কীর্তন করে... আনোয়ার বোঝে বৈকি! কতো মানুষের সঙ্গে বসে সে নিজেও বক্তৃতা শুনছে, জাতীয় পর্যায়ের কোনো এক নেতার জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনতে শুনতে ঝিমায়। বাতাস বইলে বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গত করে বাজতে-থাকা বটপাতার মর্মরধ্বনিতে তার বড়ো ঘুম পায়। (আখতারুজ্জামান, ২০০০ : ৩২৬)

বাস্তবের অন্ধকার চোখের ভেতরকার অন্ধকারকে এবং সেই সূত্রে মস্তিষ্কের অন্ধকারকে ঘনীভূত করে তোলে। আর সেই অন্ধকার আনোয়ারকে ক্রমেই টেনে নিয়ে যায় গভীর ঘুমের অতলে। ঘুমের একটা স্তরে আবির্ভাব ঘটে স্বপ্নের। স্বপ্নের রথে চড়ে মুহূর্তের মধ্যে সে চলে যায় পুরনো ঢাকায় ওসমানের চিলেকোঠা থেকে বগুড়ার প্রত্যন্ত গ্রামের বৈরাগীর ভিটায়। সেখানে জালাল মাস্টারের কথা শুনতে শুনতে বাতাসে আন্দোলিত

বটপাতার মর্মরধ্বনিতে তার ঘুম পায়। লেখক তাঁর কল্পনাশক্তির সহায়তায় আর ব্যঞ্জনাধর্মী ভাষার সহযোগে আনোয়ারের নিদ্রা ও স্বপ্নের যে রূপ ও বাস্তবতা এখানে চিত্রিত করেছেন তা এককথায় অসাধারণ, অতুলনীয়। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন আর স্বপ্নের মধ্যে আবার ঘুম। অর্থাৎ ঘুমের যে স্তরে সে স্বপ্ন দেখছে, আরেক ঘুম তাকে নিয়ে যাচ্ছে সেই স্তর থেকে আরো গভীরে। সেই ঘুমেরও এক অসামান্য চিত্র লেখক সৃষ্টি করেছেন এক অননুকরণীয় ব্যঞ্জনাধর্মী ভাষায় :

> স্বপ্নের এই ঘুম আনোয়ারের সত্যিকার ঘুমকে মস্ত বড়ো কড়াইতে ধিকি ধিকি তাপে জ্বাল হতে-থাকা দুধের মতো আওটায়। তার গালের ভেতর টাকরায় জিভ লেগে আওয়াজ হয়। আনোয়ার তারিয়ে তারিয়ে সুস্বাদু ঘুম পাড়ে। আওটানো ঘুমে সর পড়ে, ঘুমে ঘুমে সর পুরু হয়। বাইরের যাবতীয় শব্দ, গন্ধ ও রঙ সেই সরের ওপর আটকে থাকে, আনোয়ারকে ছুঁতেও পারে না। (আখতারুজ্জামান, ২০০০ : ৩২৬)

আসল ঘুমকে স্বপ্নের ঘুমের দ্বারা ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর করার বিষয়টিকে অল্প তাপে আওটানো দুধ ও তাতে সর-পড়ার সঙ্গে তুলনা করার মধ্যে মৌলিক কল্পনাশক্তির পরিচয় বিদ্যমান। বিদ্যমান মনের অচেতনলোকের ক্রিয়ার সঙ্গে বিজ্ঞানসম্মত স্বপ্নব্যাখ্যার সম্পর্কসূত্র। আওটানো দুধের মতো ঘুমেরও উপরিভাগে সর পড়ে পড়ে যে পুরুত্ব লাভ করে তা ভেদ করে বাইরের জগতের শব্দ বাধাগ্রস্ত হয়ে ভেতরে প্রবেশের পথ পায় না। আর সেই ফাঁকে গেট ভেঙে বেরিয়ে যায় ওসমান। এই অংশের পুরো বর্ণনার মধ্যে যে উন্নত কল্পনাপ্রবণতা, বিজ্ঞানবুদ্ধি, মনস্তত্ত্বজ্ঞান আর সেই সঙ্গে সাহিত্যবোধের পরিচয় লভ্য তা কথাশিল্পী হিসেবে ইলিয়াসের সার্থকতাকেই সুউচ্চ করে তোলে। বিশুদ্ধ শিল্পের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এ অংশটি হয়ে উঠেছে একাধিক উপমাসহযোগে একটি অসাধারণ চিত্রকল্প। এখানে ঘটেছে তাঁর ভাষা ব্যবহারেরও অসামান্য ব্যঞ্জনাগত সার্থকতা।

পরিণাম ও পরিশেষ

উপন্যাসের পরিণাম বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে আমরা এ প্রবন্ধের পরিশেষ বা পরিসমাপ্তি ঘটাতে চাই। মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ওসমানের সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত হওয়া, চিলেকোঠার শৃঙ্খল অতিক্রম করে খিজিরের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার আন্তর্গরজে রাজপথে বেরিয়ে যাওয়া প্রভৃতি ঘটনা প্রতীকী তাৎপর্যে অন্বিত। মধ্যবিত্ত ওসমানের অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্বের শিকার হওয়া আর খিজিরের নিম্নবর্গীয় আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে ঐকাত্ম্যবোধের বিষয়টি উপন্যাসের রাজনৈতিক পরিণামেরই এক সাংকেতিক উদ্ভাসন। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ফৌজিশাসক আইয়ুবের পতন, রাজবন্দিদের মুক্তি, রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার, সাধারণ নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে সাফল্য আনে। কিন্তু নতুন করে সামরিক একনায়কের ক্ষমতা গ্রহণের ফলে স্বপ্নদর্শী মধ্যবিত্তের মনকে আচ্ছন্ন করে নৈরাশ্যের এক প্রগাঢ় অন্ধকার। এই অন্ধকারকে

আরো গাঢ় করে তোলে যখন পূর্বতন শাসককে ঘিরে গড়ে-ওঠা স্থানীয় ক্ষমতাবান শোষক গোষ্ঠীটি পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় মুখোশ পাল্টে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে উদ্ভূত নতুন জাতীয়তাবাদী শক্তির নিরাপদ ছায়াতলে অনায়াসে স্থান করে নেয়। বগুড়ার গ্রামে আফসার গাজী আর পুরনো ঢাকায় লতিফ সর্দারের দলবদলের বিষয়টি এখানে প্রতিনিধিত্বমূলক। অন্যদিকে আইয়ুবের অনুসারী রহমতউল্লা পক্ষাঘাতগ্রস্ততায় অচল হয়ে পড়লে আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় তার ভাগ্নে ও নতুন জামাই আলাউদ্দিন শ্বশুরের সম্পত্তি দেখভালের দায়িত্ব পেয়ে বাড়িভাড়া দেড়গুণ বাড়িয়ে দেয়। এভাবে উচ্চবিত্তদের হাতে নতুন করে পর্যুদস্ত হয়ে আন্দোলনকারী মধ্যবিত্তের হতাশা দ্বিগুণভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। শহিদ তালেবের পরিবারটিও এই মধ্যবিত্তের অংশ; ভাড়াবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে বাসা ত্যাগ করতে হয় তাদের।

আর নিম্নবর্গ? খিজির আর চেংটু এই দুই প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্রই অপঘাতে মৃত্যুর শিকার। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্নও সেই সঙ্গে প্রতীকীভাবে বিপর্যস্ত। আন্দোলনের উত্তুঙ্গ পরিস্থিতিতে জাতীয়তাবাদী ও বামপন্থি দাবি-স্লোগানের দ্বন্দ্ব-সমন্বয় তীব্র হয়ে উঠলেও নিম্নবর্গের কণ্ঠ ক্রমশ স্তিমিত হয়ে পড়ে। নিম্নবর্গের প্রতি সহানুভূতিশীল মধ্যবিত্তের মনে সুতীব্র হতাশার এও এক অনিবার্য কারণ। বহুবিধ নৈরাশ্যে দগ্ধ মধ্যবিত্ত মন তাই স্বভাবতই মানসিকভাবে বিশৃঙ্খল ও ভারসাম্যচ্যুত।

সুতরাং মধ্যবিত্ত ওসমানের মনোবিকারগ্রস্ততার প্রতীকী ব্যাখ্যায় এসব রাজনৈতিক উপাদানই যুক্তিশীল পথপ্রদর্শকের ভূমিকা রাখে। সেই সঙ্গে নিম্নবর্গের প্রতি সহানুভূতিপরায়ণ মধ্যবিত্তের বামপন্থি মনটিকেও লেখক বাস্তবতার স্বার্থেই সজীব রাখতে চান। জাতীয়তাবাদী শক্তির ক্ষমতাস্পর্শী ধারার সীমাবদ্ধতাকে লেখক যথার্থভাবেই শনাক্ত করতে পারেন। আর এক্ষেত্রে তাঁর রাজনৈতিক বোধের দূরদর্শিতাও লক্ষণীয়। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের ধারায়ই একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ ও তার পরিণতিতে একটি নতুন স্বাধীন দেশের আবির্ভাবের মতো গৌরবজনক ঘটনা সংঘটিত হয়। কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তরকালে এই সীমাবদ্ধতার বিষয়টিকেই তীব্রভাবে উদ্ঘাটিত হতে দেখি। আজও আমরা এর বৃত্তাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হতে পারিনি। সুতরাং ইলিয়াস এই উপন্যাসের পরিণামে প্রতীকীভাবে যে সংকটের রূপ চিত্রিত করেছেন তার সুদূরপ্রসারী বৈশিষ্ট্যটি অনস্বীকার্য।

টীকা

১. 'কালচারাল হেজিমনি'র কথা বলেছেন ইতালির মার্কসবাদী তাত্ত্বিক আন্তোনিও গ্রামশি। তাঁর বিখ্যাত রচনা *প্রিজন নোটবুকসে* (১৯২৯-৩৫ সালে কারান্তরালে লিখিত; পরে পঞ্চাশের দশকে ইতালি ভাষায় এবং সত্তরের দশকে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত) তিনি বুর্জোয়া শ্রেণি যে সমাজে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সাংস্কৃতিক আধিপত্য সৃষ্টি করে সে-বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। পরে আমরা দেখেছি, এই

শব্দবন্ধটি সৃষ্টির বহু আগে থেকেই বুর্জোয়া শ্রেণি তার অন্যান্য রূপে অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী শোষণ প্রক্রিয়ায় এই কালচারাল হেজিমনির আশ্রয় নিয়েছে। জাতিগতভাবে বা সম্প্রদায়গতভাবেও এর অসুস্থ প্রয়োগ আমরা লক্ষ করি। অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক দিক থেকে উন্নত কোনো জাতি কর্তৃক অন্য কোনো দুর্বল জাতিকে কালচারাল হেজিমনির মাধ্যমে অবনত করে রাখার নানা দৃষ্টান্ত এই উপমহাদেশেই ঘটেছে।

২. এডওয়ার্ড ডব্লিউ সায়ীদ, 'ফুকো এবং ক্ষমতার ধারণা' ভাষান্তর : আজিজুল হক রাসেল, *মিশেল ফুকো : পাঠ ও বিবেচনা*, সম্পাদনা : পারভেজ হোসেন, সংবেদ, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ২৫৫। এ প্রবন্ধে সায়ীদ আরো বলেন, 'তিনি দেখেন অনবরত এবং ক্ষান্তিহীন ক্ষমতার বিস্তৃতি, যা বিস্তৃত হচ্ছে প্রশাসক, ম্যানেজার এবং টেকনোক্র্যাটদের মধ্যে। ফুকো যাকে আখ্যায়িত করেছেন 'ডিসিপ্লিনারি সোসাইটি' বলে। শেষের দিকের রচনায় তিনি লেখেন, ক্ষমতা বিরাজ করছে সব জায়গায়। এটি অজেয়, একত্রে কাজ করে, অনেক বেশি বিস্তৃত এবং এর কর্তৃত্ব অনাক্রম্য।' (সায়ীদ, ২০০৭ : ২৫৪)

গ্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জি

অরবিন্দ প্রধান (সম্পাদিত), তারিখবিহীন। *অপর : তত্ত্ব ও তথ্য*, হাওয়া ৪৯ প্রকাশনী, কলকাতা

এডওয়ার্ড ডব্লিউ সায়ীদ, ২০০৭। 'ফুকো এবং ক্ষমতার ধারণা' (ভাষান্তর : আজিজুল হক রাসেল), *মিশেল ফুকো : পাঠ ও বিবেচনা*, সম্পাদনা : পারভেজ হোসেন, সংবেদ, ঢাকা

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, ২০০০। *আখতারুজ্জামান রচনাসমগ্র* ২, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, প্র. প্র. ১৯৯৯

আনু মুহাম্মদ (সম্পাদক), ১৯৯৮। *তৃণমূল*, ৪র্থ সংখ্যা, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যা, ঢাকা

আলাউদ্দিন মণ্ডল, ২০০৯। *আখতারুজ্জামান : নির্মাণে বিনির্মাণে*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

এজাজ ইউসুফী (সম্পাদক), ১৯৯২। *লিরিক*, সংখ্যা আট, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যা, চট্টগ্রাম

এম. এম. আকাশ, ২০০৭। 'ক্ষমতা প্রশ্ন ও মিশেল ফুকোর মতামত', *মিশেল ফুকো : পাঠ ও বিবেচনা*, সম্পাদনা : পারভেজ হোসেন, সংবেদ, ঢাকা

গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), ২০০১। *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লি., কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, প্র. প্র. ১৯৯৮

তপোধীর ভট্টাচার্য, ১৯৯৬। *বাখতিন : তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ১৯৯৬। 'বাখতিন : তৃতীয় বিশ্বে', *এবং এই সময়* বাখতিন বিশেষ সংখ্যা, সম্পাদক : অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্থক প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪০৩, পৃ. ৪৯–১১৯

পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ২০০৭। 'ক্ষমতা প্রসঙ্গে দুই প্রেক্ষিত : গ্রামশি ও মিশেল ফুকো', *মিশেল ফুকো : পাঠ ও বিবেচনা*, সম্পাদনা : পারভেজ হোসেন, সংবেদ, ঢাকা

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৯১। *উপন্যাস রাজনৈতিক*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা

ফয়েজ আলম, ২০০৭। 'মিশেল ফুকোর ভাববিশ্ব', *মিশেল ফুকো : পাঠ ও বিবেচনা*, সম্পাদনা : পারভেজ হোসেন, সংবেদ, ঢাকা

লুনাচারস্কি, ১৯৯৬। 'দস্তয়েভস্কির কণ্ঠস্বরের বহুত্ব', *এবং এই সময়* বাখতিন বিশেষ সংখ্যা, সম্পাদক : অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্থক প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪০৩, পৃ ১–৮

শহীদ ইকবাল, ২০০৯। *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস : মানুষ ও কথাশিল্প*, অন্বেষা প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম অন্বেষা সংস্করণ। বইটির প্রথম প্রকাশ *কথাশিল্পী আখতারুজ্জামান* নামে, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৭

শুভা চক্রবর্তী দাশগুপ্ত, ১৯৯৬। 'বাখতিনের কার্নিভাল চিন্তা : কয়েকটি সূত্র', *এবং এই সময়* বাখতিন বিশেষ সংখ্যা, সম্পাদক : অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্থক প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪০৩, পৃ. ২৫–৩০

Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths and Helen Tiffin, 2003. *The Empire Writes Back*, Routledge, London & New York, Second edition reprint, First published: 1989

Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths and Helen Tiffin, 2004. *Key Concepts in Post-Colonial Studies*, Routledge, London & New York, First Indian reprint.

Boehmer, Elleke, 2005. *Colonial & Postcolonial Literature*, Oxford University Press, New York, Second edition, First published 1995.

Childs, Peter and Patrick Williams, 1997. *An Introduction to Post-Colonial Theory*, Longman, England.

Gayatri Chakravorty Spivak, 2010. "Can the Subaltern Speak?", *Reflections on the History of an Idea : Can the Subaltern Speak?*, edited by Rosalind C. Morris, Columbia University Press.

Gramsci, Anttonio, 1989. *Selections from the Prison Notebooks*, International Publishers Co. reprint, Edition 1971.